ছোটদের

লে মিজেরাবল

ভিক্তর হিউগোর প্রসিদ্ধ উপন্যাস

শ্রীঅরবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আঢ্য,
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,
২২০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২৮৷৪এ বিডন রো, কলিকাতা

দুটি কথা

'লে মিজেরাব্‌ল্‌' ফরাসী ভাষার, তথা বিশ্ব-সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভিক্তর হিউগো এর লেখক। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এই বিরাট গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। কিছু দিন আগে বাঙলায়ও এর অনুবাদ হয়েছে।

এই বিরাট মহাকাব্যের আখ্যানভাগ আমাদের দেশের ছোটদের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করা গেল। এ গ্রন্থ পাঠে তাদের কিশোর প্রাণে বিশ্ব-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে এই আশাতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

জাঁ ভাল্‌জাঁর দুঃখময় কর্ম্মময় জীবন-নাট্যকে কেন্দ্র ক'রে ভিক্তর হিউগো মানব-জীবনের যে মহানাটক রচনা ক'রে গিয়েছেন তা সত্যই অদ্বিতীয়।

এ গ্রন্থ রচনায় যে সব হিতৈষীর কাছে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি আজ তাঁদের নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। তাঁদের নাম উল্লেখ ক'রে তাঁদেব ধন্যত্ব খাটো করব না।

১১ই ভাদ্র, ১৩৪৩ সাল

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
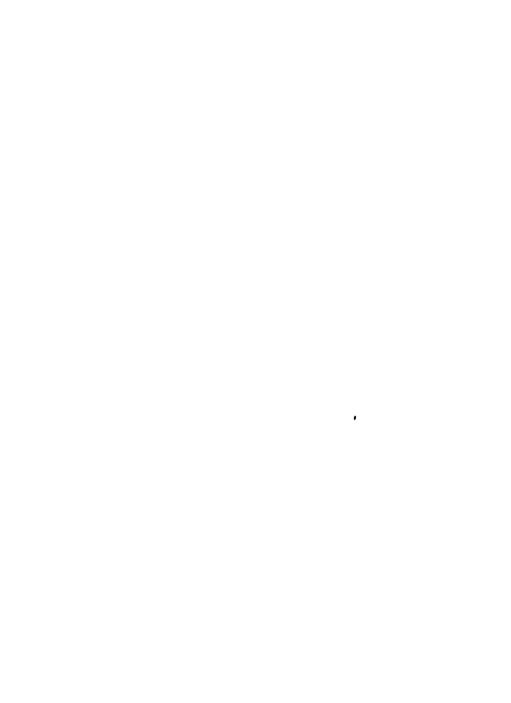
কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অসেচনকেষু

প্রথম পরিচ্ছেদ

পথে পথে

ডি— নামে ফরাসী দেশের ছোট্ট একটি শহরের এক রাস্তায় একদিন দেখা গেল, একটা লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। রাস্তা দিয়ে এমন কত লোকই ত যায়! কিন্তু এ লোকটা যেন একটু অন্য রকমের। বেঁটে খাট ছোট্ট মানুষটি! বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে। কিন্তু মনে হয় যেন পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাত-পায়ের হাড়গুলা বেশ মোটা-মোটা। মুখে একমুখ দাড়িগোঁফ। নাকটা ঠিক পাতিহাঁসের ঠোঁটের মত থ্যাব্‌ড়া। মাথায় একটা অনেক দিনের পুরানো টুপি, গায়ের কোটটা

কালো রঙের, কিন্তু তার কনুইয়ের কাছে আর পিঠের দু-তিন জায়গায় নানা রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে তালি লাগান হয়েছে। কোটের নীচে আধময়লা ছেঁড়া একটা কামিজ অবশ্য আছে, কিন্তু তার আবার একটিও বোতাম নেই। লোকটার বুকখানা বেশ চওড়া, কামিজের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে—ভালুকের গায়ের মত লোমে ভর্ত্তি। প্যাণ্টালুনের অবস্থাও ঠিক তেমনি। পায়ে মোজা নেই, কিন্তু জুতা আছে। লোহার নাল দেওয়া একজোড়া ছেঁড়া জুতা। চলবার সময় খট্ খট্ ক'রে আওয়াজ হচ্ছে। লোকটার হাতে একটা মোটা লাঠি, আর কাঁধে থলের মত বোঁচকা। বেচারা সারাদিন ধ'রে হাঁটছে হয় ত। কপাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ঘাম ঝরছে। রাস্তায় তখনও আলো জ্বলেনি। সন্ধ্যে হতে দেরী আছে।

রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা হোটেল দেখতে পেয়েই লোকটা থমকে দাঁড়াল। একবার সাইন-বোর্ডটার দিকে তাকাল, একবার এদিক-ওদিক চাইলে, তারপর সটান্ ভিতরে ঢুকে পড়ল।

হোটেলের মালিক যিনি, তিনিই রান্নার কাজ করেন। রান্নাঘরে উনুনে তখন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, রান্নাও চলছে। পাশের ঘরে মনে হ'ল যেন কতকগুলি লোক হল্লা করছে, গান গাইছে। তাদেরই জন্যে হোটেলওয়ালা বোধ হয় খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত।

দরজা ঠেলে লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেখে হোটেলওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে, 'কি চাই?'

লোকটা বললে, 'খাবার চাই।—আর একটুখানি থাকবার জায়গা।'

হোটেলওয়ালা মুখ তুলে তাকালে। লোকটার চেহারা দেখে তার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। বললে, 'পয়সাকড়ি আছে ত ?'

'আছে বই কি!' ব'লে সে তার পকেট থেকে চামড়ার একটা থলির মত মনিব্যাগ বের করলে।

মনিব্যাগটা সে বের করলে বোধ করি পয়সা তার আছে তাই জানাবার জন্যে। কারণ, সেটা সে তক্ষুনি তার পকেটে রেখে দিয়ে দরজার কাছে একটা টুলে গিয়ে বসল। বোঁচ্‌কাটা টুলের পাশে নামিয়ে হাতের লাঠিটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে, 'খাবার তৈরি হ'তে কি দেরী হবে ?'

'না দেরী কি'রে ? দেরী কেন হবে ?' ব'লেই হোটেল-ওয়ালা তার টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। টেবিলের দেরাজ থেকে একটা পেন্সিল বের ক'রে সেদিনের যে খবরের কাগজটা টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল, তারই কোণের দিকে একটুখানি সাদা জায়গা ছিঁড়ে নিয়ে সর্‌ সর্‌ ক'রে কি যেন লিখলে, তারপর সেই কাগজের টুক্‌রাটি হাতে নিয়ে ডাকলে, 'ছোক্‌রা!'

বারো-চোদ্দ বছরের ছোট্ট একটি ছেলে কাছে এসে দাঁড়াল। হোটেলওয়ালা তার হাতে সেই কাগজের টুকরাটি দিয়ে কানে-কানে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে কি যে বললে কিছুই শোনা গেল না।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হোটেলওয়ালা তাকিয়ে দেখলে, লোকটা তখনও ঠিক তেমনি ভাবে চুপ ক'রে ব'সে আছে। ব'সে ব'সে ঝিমোচ্ছে।

ছেলেটার ফিরে আসতে দেরী হ'ল না। খানিক পরেই সে ফিরে এসে আর একটা কাগজের টুক্‌রা তার মনিবের হাতে দিয়ে সেখান থেকে চ'লে গেল।

কাগজের লেখাটুকু প'ড়ে হোটেলওয়ালা আপন মনেই একবার ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ!'

তারপর চুপ ক'রে কি যেন ভাবলে। ভেবেই সে উঠে দাঁড়াল। আগন্তুক যেখানে বসে ছিল, ধীরে-ধীরে সেইখানে গিয়ে বললে, 'দেখুন, আপনার থাকবার জায়গা—উহুঁ, এখানে কিছু হবে-টবে না।'

'তার মানে?'—ব'লেই লোকটি মুখ তুলে চাইলে। 'ভেবেছেন আমার পয়সাকড়ি নেই? না, আগাম কিছু দিতে হবে? বলুন না স্পষ্ট ক'রে?'

'না, না, তা নয়।'

'তবে?'

হোটেলওয়ালা কেমন যেন একটুখানি ইতস্তত ক'রে বললে, 'দেখুন, আমার এখানে জায়গার বড় অভাব।'

'আপনার ওই আস্তাবলের এক পাশে আমি প'ড়ে থাকব।'

'উহুঁ, তা হয় না।'

'কেন হবে না?'—লোকটি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'খুব হবে। যেখানে হোক্ জায়গা একটুখানি আমি ক'রে নেব।

এমন লোক স্যর, ফরাসী মুল্লুকে একটি মাত্র আছে

ওই সিঁড়ির পাশে, না হয় এই এইখানেই। এক আঁটি খড় দিতে পারবেন ত? যাক্‌, সে ভাবনা আপনাকে ভাব্‌তে হবে না, আগে খেতে দিন চারটি।'

হোটেলওয়ালা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না, খাবারও আপনাকে আমি দিতে পারব না।'

স্পষ্ট পরিষ্কার জবাব!

লোকটি উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমার অবস্থাটা কি একবার ভেবে দেখেছেন? খিদেয় আমি ম'রে যাচ্ছি, আর দাঁড়াতে পারছি নে। সকাল থেকে বার মাইল রাস্তা হেঁটেছি।'

হোটেলওয়ালা আবার বললে, 'তাহোক্‌, খাবার আমার নেই।'

লোকটি হঠাৎ পাগলের মত হো হো ক'রে হেসে উঠল। বড় বড় ডেক্‌চিতে যেখানে খাবার ঢাকা ছিল সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'এগুলা কি?'

'ও সব অন্যের জন্যে। দেখতে পাচ্ছেন না—পাশের ঘরে লোক-জন সব রয়েছে!

'কয় জন লোক?'

'বার জন।'

'বার জন? আর এই এত এত খাবার, কুড়ি-পঁচিশ জন খেয়েও শেষ করতে পারবে না।'

ব'লেই সে আবার তার সেই টুলের উপর গিয়ে বসল। বললে, 'হোটেলে এসেছি, আমার খিদে পেয়েছে, না খেয়ে আমি উঠব না।'

হোটেলওয়ালা বললে, 'আচ্ছা মানুষ ত! উঠবে না কি রকম! ওঠ।'

লোকটি আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হোটেলওয়ালা হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'খুব হয়েছে! থাম। ভেবেছ তোমায় আমি চিনতে পারি নি, না? বলব তোমার নাম, বলব তুমি কে? তোমায় দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই তৎক্ষণাৎ আমি ফাঁড়িতে খবর পাঠিয়েছিলাম। দেখবে তারা কি জবাব দিয়েছে? এই দেখ, পড়। পড়তে জান?'

এই ব'লে সেই কাগজের টুক্‌রাটি তার হাতে দিয়ে হোটেল-ওয়ালা বললে, 'কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার আমি করি নে, বুঝলে? তোমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার আমি করতে চাই নে; আমি বুঝতে পেরেছি তুমি জাঁ ভাল্‌জাঁ। বাস্, এবার তুমি ধীরে ধীরে ওঠ।'

লোকটি আর একটি কথাও বললে না। মাথা হেঁট ক'রে তার সেই ঝোলাটি তুলে নিয়ে সত্যিই সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, তারপর অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে একবার তার মুখের পানে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার সেই পথ! কোথায় যাবে, কোথায় গেলে চারটি খেতে পাবে, কে তাকে আজ রাত্রির মত একটুখানি আশ্রয় দেবে,— এই তার একমাত্র চিন্তা।

ভাবতে ভাবতে সে পথ চলতে লাগল।

বড় হোটেল থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলে, এখন কি ছোট-খাট

কোনও হোটেলে গেলে সে আশ্রয় পাবে? দেখা যাক্‌। চেষ্টা ক'রে একবার দেখতে দোষ নেই। রাত্রি হয়ে আসছে, খিদেও বাড়ছে।

পথের ধারে ছোট্ট একটি হোটেল। ঘরের মধ্যে মিটমিট ক'রে একটি আলো জ্বলছে। যা থাকে কপালে ব'লে জাঁ ভাল্‌জাঁ আবার সেখানে গিয়ে ঢুকল।

ঘরের ভিতর থেকে গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'কে?'

'এখানে খাবার পাওয়া যাবে? আর রাত্রির মত একটুখানি জায়গা?'

'হ্যাঁ, পাবেন। ভিতরে আসুন।'

সে ঘরে ঢুকতেই সবাই তার মুখের পানে কেমন যেন হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকবার মতই চেহারা বটে! তা হোক্‌ হোটেলওয়ালা বললে, 'বসুন এইখানে, খাবার আনছি।'

চওড়া একটা বেঞ্চি পাতা ছিল। বোঁচ্‌কাটা নামিয়ে বেশ একটু আরাম ক'রে জাঁ ভাল্‌জাঁ পা ছড়িয়ে বলল, 'আঃ, এতক্ষণ পরে যেন বাঁচলাম।'

ঘরের ভিতর যে ক'জন লোক বসেছিল তার মধ্যে মোটামত যে লোকটা, সে মাছের ব্যবসা করে। গ্রাম থেকে দু-এক দিন অন্তর প্রায়ই তাকে শহরে আসতে হয়। ঘোড়ায় চ'ড়ে আসা-যাওয়া করে। বড় হোটেলে থাকার খরচ বেশি, তাই থাকে সে এইখানেই। তবে ঘোড়াটা রাখবার জায়গা এখানে হয় না। খানিক আগে জাঁ ভাল্‌জাঁকে যে হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিলে

সেই হোটেলের আস্তাবলে সে তার ঘোড়াটা এক্ষুনি রেখে এল।

হোটেলওয়ালা বোধ করি ভাল্‌জাঁর খাবার আনতেই যাচ্ছিল, এমন সময় এই মাছের ব্যবসাদারটা হাতের ইসারা ক'রে তাকে বললে, 'শোন!'

হোটেলওয়ালা তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে তার কানে কানে কি যেন বললে।

বাস্! হোটেলওয়ালা তৎক্ষণাৎ জাঁ ভাল্‌জাঁর পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, 'না বাপু, এখান থেকে তোমায় সরতে হ'ল।'

ভাল্‌জাঁ আরাম পেয়ে বোধ করি ঘুমিয়েই পড়েছিল। আচমকা চমকে উঠে বললে, 'কি, দিয়েছ খাবার?'

হোটেলওয়ালা বললে, 'না, এখানে থাকা তোমার চলবে না, তুমি আর কোথাও যাও।'

'ও, তোমরাও তাহ'লে জান?'

'হ্যাঁ, আমরাও জানি।'

'কিন্তু দেখ, আর একটা হোটেল থেকেও আমাকে এমনি ক'রে তাড়িয়ে দিলে।'

'আমরাও দিচ্ছি।'

'তাহ'লে আমি এখন যাই কোথায়?'

হোটেলওয়ালা একটুখানি হেসে বললে, 'যেখানে তোমার খুশী।'

জাঁ ভাল্‌জাঁ আবার উঠল। আবার সেই বোঁচ্‌কাটি তার

কাঁধে নিয়ে আবার সেই তার লাঠিটি হাতে ক'রে পথে নেমে এল।

আগেকার হোটেল থেকেই কয়েকটা দুষ্ট ছেলে তার পিছু লেগেছিল, এবার তারা তার পিঠের ওপর ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে স্বরু করলে।

ঢিল খেয়ে সে পথের মাঝখানে পিছন ফিরে একবার রুখে দাঁড়াল, লাঠি দেখিয়ে বললে, 'আয়, তোদের মেরে আমি খুন ক'রে ফেলব।'

যেই বলা, ছেলের দল তখন চোঁ চোঁ দৌড় মেরেছে।

তারপরেই দেখা গেল, রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড লোহার ফটক-ওয়ালা একটা বাড়ী। ভালজাঁ দেখেই চিনতে পারলে সেটা জেলখানা। জেলখানায় আশ্রয় পাওয়া যায় না? কিন্তু না, সে জানে, সেখানে আশ্রয় পেতে হ'লে তার আগে মস্ত একটা অপরাধ করতে হবে।

সে পথ ছেড়ে দিয়ে ভালজাঁ অন্য পথ ধরলে। পথের দু পাশে ছোট ছোট বাগান আর তার মাঝখানে এক একটি বাড়ী। বাড়ীগুলার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে সে পথ চলতে লাগল। প্রত্যেকটি বাড়ী চমৎকার। দোতলায় আলো জ্বলছে।

একতলা একটি বাংলোর মত বাড়ী দেখে জাঁ ভালজাঁ থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। জানালায় জানালায় সবুজ রঙের পর্দ্দা ঝুলছে। একটা পর্দ্দার ফাঁকে দেখা গেল, ঘরের ভিতর বেশ পরিপাটিভাবে আসবাবপত্র সাজান, একটা

জানালার কাছে একটি দোলনা দুলছে, মেঝের ওপর একটি সাদা চাদর-ঢাকা টেবিল, দেয়ালে একটা দো-নলা বন্দুক।

ঘরের এক দিকে বসে আছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তার পায়ের ওপর ছোট্ট একটি ছেলে। পাশেই এক যুবতী বসে—তারও কোলে একটি শিশু। ছেলে দুটি খিল খিল ক'রে হাসছে, তাদের মা হাসছে, বাবাও হাসছে। ঘরের মধ্যে যেন আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

জাঁ ভাল্‌জাঁ ভাবলে, এত আনন্দ যেখানে, আশ্রয় সেখানে হয় ত বা একটুখানি মিলতেও পারে।

এই ভেবে সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে টুক্‌টুক্‌ ক'রে দরজায় শব্দ করতেই ভিতর থেকে মেয়েটি বোধ করি ব'লে উঠল, 'দেখ ত দোরে কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে।'

গৃহস্বামী বললে, 'কই, কেউ না।'

তারপর আবার শব্দ হতেই মেয়েটি বললে, 'ওই শোন!'

আলো হাতে নিয়ে ভদ্রলোক উঠে এল। দরজা খুলে বললে, 'কে?'

জাঁ ভাল্‌জাঁ বললে, 'সামান্য একজন পথিক। চারিটি খেতে দিবেন? আর ওই বাগানের পাশে আপনার ছোট্ট যে ঘরখানা রয়েছে রাত্রির মত ওইখানে পড়ে থাকব?'

একটু থেমে আবার সে বললে, 'আমি অবশ্য দাম দিব তার জন্যে।'

বাড়ীর মালিক তখন তার হাতের আলোটা আর একটু তুলে ধ'রে তাকে ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

পরে বললে, 'পয়সাই যদি খরচ করবে ত হোটেলে গেলে না কেন ?'

'হোটেলে জায়গা নেই।'

'জায়গা নেই ? সে কি হে ? অসম্ভব। এখানকার ওই যে—আহা কি নাম—ওই যে হে, সেই আস্তাবলওয়ালা বড় হোটেলটায় গিয়েছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'কি হ'ল সেখানে ? কি বললে ? জায়গা নেই ?'

বলবার ইচ্ছা তার ছিল না, তবু তাকে বলতে হ'ল। বললে, 'কেন জানি নে, তারা আমায় দেখেই বললে এখানে কিছু হবে না।'

'তাছাড়া ত আরও অনেক ছোট ছোট হোটেল এখানে আছে, সেখানে গেলে না কেন ?'

সে বললে, 'আরও এক জায়গায় গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও সেই এক কথা। বললে, 'হবে না।'

আর বেশি কিছু বলবার দরকার হ'ল না। ভদ্রলোকের মুখে চোখে তখন সন্দেহের ছাপ পড়েছে। কেমন যেন অগ্রাহ্যের সঙ্গে ভদ্রলোক আবার তার হাতের লণ্ঠনটা তু'লে ধ'রে তাকে ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

খানিক পরে বললে, 'বুঝেছি। যাও, এখানেও কিছু হবে না।'

তা সে আগেই বুঝেছে। তবু বললে, 'কিন্তু এক গ্লাস জল—'

'না, না, জলটল হবে না এখানে, আমি ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি, তুমি যাও।'

ব'লেই সে হড়াস্‌ ক'রে দরজাটা তার মুখের উপরেই বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল। ভিতরে গিয়ে জানালাগুলাও বন্ধ ক'রে দিলে।

সেখানেও কিছু হ'ল না।

ভাল্‌জঁা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে খানিক দূর গিয়ে দেখলে পথের পাশে তেরপল্‌ খাটিয়ে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে, রাস্তা যারা মেরামত করে তাদের যন্ত্রপাতি রাখবার জন্যে এইরকম ছোট ছোট অস্থায়ী কুঁড়ে তাদের মাঝে মাঝে বানিয়ে নিতে হয়।

খাবার ত আজ আর কপালে জুটল না। শীত থেকে বাঁচতে হ'লে এখানেই তাকে রাত কাটাতে হয়। তাই সে হামাগুড়ি দিয়ে কুঁড়েটার ভিতর গিয়ে ঢুকল। যাক্‌, কতকগুলা খড়ও পাওয়া গেছে। বোঁচ্‌কা আর লাঠিগাছটি মাথার নীচে বালিশের মত ক'রে রেখে আরাম ক'রে সে পা ছড়িয়ে শুতে যাচ্ছে, এমন সময় দেখলে, বাঘের মত প্রকাণ্ড একটা কুকুর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা বোধ করি এই কুঁড়ের ভিতর আরাম ক'রে ঘুমিয়েছিল, গায়ে তার হাত ঠেকতেই জেগে উঠে চীৎকার সুরু করলে। লাঠি উঁচিয়ে ভাল্‌জঁা বারকতক তাকে তাড়াবার চেষ্টা ক'রে দেখলে, কিন্তু কিছুতেই সে তার নিজের অধিকার ছাড়লে না। তাড়ান অসম্ভব। যত সে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করে ততই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তাকে কামড়াতে আসে!

সর্ব্বনাশ! এখান থেকেও তাকে সরতে হ'ল! সামান্য একটা পথের কুকুর—তারও আশ্রয় মিলেছে। সেও তাকে একটুখানি অনুকম্পা করলে না।

এবার সে ভাবলে আর লোকালয়ে নয়; মানুষ যেখানে আছে সেখানে সে আর যাবে না। হোক্ দুরন্ত শীত, তবু সে কোনও গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটাবে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক স্পষ্ট—পরিষ্কার।

পথ চলতে চলতে দেখলে সে শহরের বাইরে চলে এসেছে। হু হু ক'রে চারিদিক থেকে শীতের বাতাস বইছে। শহরের ভিতর যতক্ষণ ছিল শীতের এই মারাত্মক কন্‌কনানি ততক্ষণ বুঝতে পারে নি। দারুণ এই শীতের রাত্রে গাছতলাতেই বা বসে থাকে কেমন ক'রে! আশা—সে যতই দুরাশা হোক, মানুষ সহজে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে না। ভাল্‌জাঁ পথের মাঝে থম্‌কে একবার দাঁড়াল। তারপর কি যেন ভেবে সে আবার পিছন ফিরে শহরে ঢুকল। যে-পথে এসেছিল এবার আর সে পথে নয়, এবার সে আর-একটা রাস্তা ধরে অন্য দিক দিয়ে চলতে লাগল।

খানিক দূর গিয়েই দেখলে সুমুখে একটা গির্জ্জা। গির্জ্জার আশে-পাশে ছোট-বড় নানা রকমের কয়েকখানি বাড়ী। রাস্তার ধারে ছোট্ট যে বাড়ীখানির পাশ দিয়ে সে পার হ'য়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে হতেই একবার সে তার জানালার পথে উঁকি মেরে দেখলে। দেখলে, ভিতরে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি রয়েছে। বোধ হয় একটা ছাপাখানা। লোকজন সেখানে কেউ রাত্তির বেলা

থাকে ব'লে ত মনে হ'ল না। বাড়ীটার দোরের কাছে বেঞ্চির মত কি যেন পাতা রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলে, বেঞ্চি ঠিক নয়—পাথরের বেদী। ভালই হ'ল। শোবার একটুখানি জায়গা মিলেছে। ভাল্‌জাঁ সেই বেদীটার উপর পা ছড়িয়ে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ল।

এক মিনিটও পার হয় নি, এমন সময় দূর থেকে মেয়েলী গলায় কে যেন ব'লে উঠল, 'কে ওখানে শুয়ে রয়েছ? কে তুমি?'

বা রে বাঃ! এখানেও তাই! ভারি রাগ হ'ল। বললে, 'দেখতে পাচ্ছ না? কেউ নয়, একটা মানুষ।'

'তা ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওখানে কেন?' বলতে বলতে সে তার কাছে এগিয়ে এল।

জাঁ ভাল্‌জাঁ তাকিয়ে দেখলে—এক বুড়ী।

বুড়ী বললে, 'এখানে শুয়ে কেন বাবা? এই শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা এই পাথরের বেঞ্চির ওপর ...'

'উনিশ বছর ধ'রে কাঠের বেঞ্চিতে শোয়া আমার অভ্যেস।'

'ও, বুঝেছি। তা বাছা তুমি কোনও হোটেলে গেলেই ত পারতে।'

'পয়সাকড়ি কিছু নেই।'

'কিচ্ছু নেই? আহা বাছা রে আমার!'

বুড়ীর বোধ হয় দয়া হ'ল। বললে, 'দেখ বাবা, আমার কাছে দুটি আনি আছে, নেবে?'

'দাও।' ব'লে হাত পেতে আনি দুটি সে নিলে।

বুড়ী কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে রইল। বললে, 'ওদিয়ে ত তোমার কোনও হোটেলে খাওয়া চলবে না বাবা, তবে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। আর এই শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা এই পাথরের উপর শুয়েই বা তুমি থাকবে কেমন ক'রে? দেখ, একবার চেষ্টা ক'রে কোনও হোটেলে হয় ত পয়সা না নিয়েও গরীব ব'লে দয়া ক'রে চারটি খেতে দিতেও পারে।'

'অনেক জায়গাতেই গিয়েছিলাম মা—'

'গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ মা, গিয়েছিলাম, কিন্তু সবাই দিয়েছে তাড়িয়ে।'

বুড়ী ধীরে ধীরে তার আরও কাছে এগিয়ে এল।

জাঁ ভাল্‌জাঁ তখন উঠে বসেছে।

অদূরে গির্জ্জার পাশেই পাদরী-সাহেবের প্রকাণ্ড বাড়ী। সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে, 'ওই বাড়ীতে গিয়েছিলে?'

ঘাড় নেড়ে ভাল্‌জাঁ বললে, 'না।'

বুড়ী তখন বললে, 'যাও তুমি ওখানে, একবার গিয়ে দেখ।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহানুভব বিশপ

বিশপ তাঁর বোনের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন, এমন সময় বাইরের দরজায় শব্দ হ'ল।

বিশপ বললেন, 'ভিতরে আসুন।'

দরজা ঠেলে যে-লোকটি ঘরে ঢুকল তাকে আমরা আগেই দেখেছি। সেই জঁা ভাল্‌জঁা।

বুড়ী ঝি কি একটা কাজের জন্য দরজার দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ এই অদ্ভুত লোকটিকে দেখে সে চম্‌কে পিছু হটে এল। বিশপের বোন ত অবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন

বিশপ বোধ করি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন—কি সে চায়, এমন সময় জঁা ভাল্‌জঁা নিজেই বলে উঠল—

'আমাকে দেখে আপনারা ভয় পাবেন না, আমি একজন জেল-ফেরত কয়েদী হ'লেও আমি মানুষ। উনিশ বছর আমি জেলে কাটিয়ে ছাড়া পেয়েছি এই সবে চার দিন। এই চারদিন ধ'রে আমার চলার কামাই নেই। আজ আমি হেঁটেছি বার-তের মাইল। হেঁটে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খিদেও পেয়েছে খুব। দু-তিনটে হোটেলে গিয়েছিলাম, কিন্তু কয়েদী ব'লে সবাই আমায় তাড়িয়ে দিলে। শেষে আর কোথাও কিছু না

পেয়ে হয়রান হয়ে গিয়ে ওইখানে ওই ছাপাখানার সুমুখে পাথরের একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়েছিলাম। এক বুড়ী এসে আপনার এই বাড়ীটি দেখিয়ে দিয়ে বললে, তুমি ওখানে গিয়েছিলে? বললাম, না। তখন সে বললে, ওখানে তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।—তাই আমি এখানে এসেছি।'

নিজের কথাগুলা সে গড়্‌গড়্‌ ক'রে ব'লে গেল।

বুড়া ঝি বোধ করি টেবিলের উপর চাদর বিছিয়ে খাবার ব্যবস্থাই করছিল।

বিশপ বললেন, 'টেবিলের ওপর আর এক প্রস্ত কাঁটা-ছুরি দাও।'

জাঁ ভাল্‌জাঁ ঝির দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, 'থাম।'

ব'লেই সে বিশপের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, 'বললাম না, আমি কয়েদী! বললাম না, এই সবে আমি জেল থেকে বেরিয়েছি! আমার জন্যে এত কেন?'

এই ব'লে সে তার পকেট থেকে হলুদ রঙের প্রকাণ্ড একটা কাগজ বের করলে। বললে, 'এই দেখুন, এই আমার ছাড়পত্র। এইটির জন্যেই কেউ আর আমায় আশ্রয় দিলে না। দেখবেন প'ড়ে? আচ্ছা থাক্‌, আমিই প'ড়ে শোনাচ্ছি। লেখাপড়া আমি একদম জানতাম না, জেলখানাতেই শিখেছি। লেখাপড়া শিখতে যারা চায় তাদের জন্যে সে ব্যবস্থাও আছে জেলখানায়। শুনুন,—জাঁ ভাল্‌জাঁ নাম, দেশ হ'ল গিয়ে…' থাক্‌, সে কথা জেনে আর কি হবে? তারপর—হ্যাঁ, 'উনিশ বছর জেল খেটেছে। চুরি করার জন্য পাঁচ বছর, আর চার-চার বার জেল থেকে

পালাবার চেষ্টা করেছিল। দুবার পালিয়েও ছিল। তাইতে ধরা প'ড়ে আরও চোদ্দ বছর।—সাংঘাতিক মানুষ।' বাস্‌, শুধু এই জন্যেই কেউ আমায় আশ্রয় দেয় নি। আপনি দেবেন? আমার কিন্তু ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে।'

বিশপ বললেন, 'আপনি বসুন।'

'আপনি!' আপনি সম্বোধন শুনে সে অবাক্‌ হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

তিনি কিন্তু বুড়ী ঝিকে আবার ডাকলেন। ডেকে বললেন, 'ওইদিকের ওই ঘরে পরিষ্কার সাদা চাদর বিছিয়ে এর জন্যে একটা বিছানা ক'রে দিও।'

ঝি বোধ করি বিছানা পাতবার জন্যেই চলে গেল।

জাঁ ভাল্‌জাঁর মুখখানা তখন কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। আনন্দে বোকার মত হয়ে গিয়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কথা বলতে গিয়ে দেখলে মুখ দিয়ে ভাল ক'রে আর কথা বেরয় না। থতমত খেয়ে যেন অতিকষ্টে সে বললে—

'সত্যি? য়্যাঁ? আপনি আমায় সত্যিই খেতে দেবেন? সত্যি থাকতে দেবেন এইখানে? তাড়িয়ে দেবেন না? আপনি আমায় 'আপনি' বলছেন কেন শুনি? আমি—আমি কয়েদী!'

এই ব'লে সে বিশপের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

তারপর আবার বললে, 'আমি ভেবেছিলাম,—আপনি নিশ্চয়

‘দাও !’ বলে হাত পেতে আনি দুটি সে নিলে

আমায় তাড়িয়ে দিবেন। সেই জন্যে প্রথম এইখানে ঢুকেই আমি আমার সত্য পরিচয়ই দিয়েছিলাম। যাই হোক্, আপনি আমায়... আমি খেতে পাব তা হ'লে? বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করলেন! উঃ, উনিশ বছর—উনিশ বছর আমি বিছানার মুখ দেখতে পাই নি।'

বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে এল।

টেবিলের উপর বুড়ী ঝি রূপার কাঁটা-চামচ নামিয়ে দিয়ে গেল।

বিশপ বললেন, 'ভয়ানক শীত, না? আচ্ছা টেবিলটাকে আপনি ওই আগুনের দিকে সরিয়ে নিয়ে চলুন ত।

আবার 'আপনি!'

'দয়া ক'রে আপনি আমায় আর 'আপনি' বলবেন না।'

বিশপ একটুখানি হাসলেন।

টেবিলের উপর ল্যাম্পে ভাল আলো হচ্ছিল না, বুড়ী ঝিকে সে কথা বলতেই সে অন্য ঘর থেকে রূপার দুটি বাতিদান এনে জ্বালিয়ে দিল।

জাঁ ভাল্‌জাঁ বললে, 'আমায় এত সম্মান দেখিয়ে আপনি আর লজ্জা দিবেন না। আমি কে তা ত আপনাকে আগেই বলেছি।'

বিশপ তার পাশে গিয়ে বসলেন। বসে তার একখানি হাত চেপে ধ'রে বললেন, 'তুমি কে, সে কথা বলবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এ বাড়ী আমার নয়, এ বাড়ী ভগবান যীশু খৃষ্টের। দীন দুঃখী ক্ষুধার্ত্ত আতুরের জন্যে এ বাড়ীর দরজা চিরদিন খোলা

থাকবে। তোমার নামের কি প্রয়োজন আমার কাছে? তোমার নাম যে একটা আছে, তা আমি আগেই জানতাম।'

'জানতেন? আমার নাম আপনি জানতেন?

বিশপ বললেন, 'হাঁ, জানতাম। জানতাম যে তুমি আমার ভাই!'

নির্ব্বাক বিস্ময়ে জাঁ ভাল্‌জাঁ আবার কিছুক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল। তারপর বললে, 'দেখুন, এখানে আসবার আগে খিদের জ্বালায় আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না, কিন্তু আপনার এই সব কথাবার্ত্তা শুনে,—আচরণ দেখে সত্যি বলছি আমি—এখন আর আমার খিদে তৃষ্ণা কিচ্ছু নেই। কি যে হ'ল, কিছু বুঝতে পারছি নে।'

বিশপ তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, 'জীবনে তুমি বড় বেশী কষ্ট পেয়েছ, না?'

'সে কথা আর বলবেন না। জীবনে এমন কষ্ট কিছু নেই যা আমি ভোগ করি নি। আমার চেয়ে সামান্য একটা পথের কুকুরও বেশী সুখে থাকে। যাক্, সে কথা বলে আর কোন লাভ নেই। উনিশটি বছর আমি এমনি ক'রে কাটিয়েছি। আর পারছি নে।'

এমন সময় ঝি এসে টেবিলের উপর খাবার ধ'রে দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কথা বন্ধ হ'ল।

জাঁ ভাল্‌জাঁ গো-গ্রাসে খেতে লাগল, দেখে মনে হ'ল, যেন সে অনেকদিন কিছু খায় নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শয্যায়

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশপ নিজে একটি বাতিদান টেবিল থেকে তুলে নিলেন, অপরটি অতিথিকে দিয়ে শোয়ার ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

যে-ঘরে অতিথির শয়নের ব্যবস্থা হয়েছে সেটি প্রার্থনা-ঘর, একপাশে পর্দা-ঢাকা একটি কামরা, তাতেই অতিথির শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রার্থনা-ঘরে যেতে হ'লে বিশপের শোয়ার-ঘরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাঁরা যখন প্রার্থনা-ঘরে যাচ্ছিলেন তখন ঝি খাওয়ার শেষে বাসনপত্র ধুয়ে মুছে তাকের উপর সাজিয়ে রাখছিল। প্রতিদিনই নিয়মিত সে রাত্তিরে এ কাজ করে।

অতিথি শয্যা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। জীবনে এমন ধব্‌ধবে ফরসা বিছানায় শোবার সুযোগ সে কখনও পায় নি। বিছানার কাছেই একটি ছোট্ট টেবিল, বিশপ হাতের মোমবাতিটা তার উপর রেখে অতিথিকে বললেন, 'নাও, এবার চুপ ক'রে শুয়ে পড়। আশা করি, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না। কাল ভোরে যাওয়ার আগে খানিকটা টাট্‌কা দুধ খেয়ে যেও। দুধ আমার কিনতে হয় না, বাড়ীতে গাই আছে।'

লোকটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিশপকে আর একবার নমস্কার

করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই, লোকটি এমন একটা ব্যাপার ক'রে বসল যে, ঝি-চাকরেরা তা দেখতে পেলে ভয়ে শিউরে উঠত। লোকটি ধাঁ ক'রে এগিয়ে গিয়ে বিশপের দুখানা হাত ধ'রে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এমনি ভাবে তাকাল যে, দেখে মনে হ'ল, লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি। তারপর মোটা গলায় ব'লে উঠল, 'আপনি কি সত্যি আমায় আপনার শোবার-ঘরের এতকাছে থাকবার জায়গা দিলেন? আপনার মনে কি এতটুকু ভয়-ডর নেই?'

লোকটা একবার থেমে পুনরায় শয়তানের হাসি হেসে বলতে লাগল, 'আমায় এখানে শুতে দেওয়া উচিত কি-না তা কি আপনি বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখেছেন? এমনও ত হতে পারে যে, আমি আপনাকে খুন করতে পারি? কে আপনাকে রক্ষা করবে?'

বিশপ মৃদু হেসে বললেন, 'সে ভাবনা আমার নয় বন্ধু, যিনি দুনিয়ার সকলকার জন্যে ভাবেন তিনিই ভাবছেন।'

তারপর তিনি গম্ভীরভাবে আপন মনে প্রার্থনা-মন্ত্র আওড়ালেন এবং দুটি আঙুল তুলে লোকটিকে আশীর্ব্বাদ করলেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় লোকটা কিন্তু একবারও মাথা নোয়াল না। সোজা পিছন ফিরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিশপ যাবার সময় একবার অল্পক্ষণের জন্যে প্রার্থনা ক'রে পর্দ্দা টেনে দিয়ে চলে গেলেন।

একটু পরেই বিশপ বাগানে বেড়াতে লাগলেন। রোজই তিনি রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া ক'রে এমনিভাবে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ান।

এবং আপন মনেই নানা প্রশ্নের সমাধান চেষ্টা করেন। আজও সেই নিয়মের অন্যথা হ'ল না।

লোকটি সারা দিনের পথশ্রমে ও অনাহারে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই পেট ভ'রে খেতেই তার দু চোখ জড়িয়ে এল। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

বিশপ মধ্যরাত্তিরে বাগানে বেড়িয়ে ঘরে ফিরে এলেন। এবং একটু পরেই সারা বাড়ীটাই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাগরণে

মাঝ রাত্তিরে ভাল্‌জাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

তখন তার মনের অবস্থাটা ঠিক ছিল না। কি যেন একটা গোলমাল পাকিয়ে গেছে। খাবার সময় টেবিলে রূপার বাসন ও ছুরি কাঁটা দিয়েছিল—সেগুলিই তাকে পেয়ে বসল। সে ভাবল, ওই ত ওঘরের তাকের উপরেই ত সব সাজান রয়েছে। কত দূরই বা, হাত কয়েকের বেশী হবে না। শোয়ার-ঘরে আসবার সময় ঝিকে সাজিয়ে রাখতে দেখেছিল। বাসনগুলি ওজনে বেশ ভারী এবং পুরানো, আজকালকার মেকীর যুগের তৈরী নয়। বড় গামলাটি বিক্রী করলে গোটা পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যেতে পারে।

আকাশ-পাতাল কত কি সে ভাবল, কিন্তু কিছুই সাব্যস্ত করতে পারল না। রাত তখন তিনটা বেজে গেছে। বিছানার উপর উঠে বসে হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা দেখল, সেটা মেঝেতে প'ড়ে ছিল। এমন সময় গীর্জ্জার ঘড়ি ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠতেই সে যেন জেগে উঠল।

তার মনে হ'ল, মতলব হাসিল করবার ইঙ্গিতই যেন গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজানর মধ্যে রয়েছে। মুহূর্ত্তকাল ইতস্তত কি ভাবল, তারপর কান খাড়া ক'রে যেন কি শুনতে চেষ্টা

করল। বাড়ীর সকলেই তখন গভীর ঘুমে অচেতন। এই সুযোগে কাজ হাসিল না করলে এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে পায়ের জুতা ঝোলার মধ্যে রেখে পা টিপে টিপে সে জানালার সুমুখে গিয়ে বাইরেটা দেখে নিল। রাত খুব অন্ধকার নয়, পরিষ্কার জ্যোৎস্নাও নয়, আকাশে একখণ্ড মেঘ জমে চাঁদকে ঢেকে রেখেছে, তাই চাঁদ জ্যোৎস্না বিলাবার পূরা সুযোগ পাচ্ছে না। ঘরও খুব আঁধার নয়, বাইরের আলো-আঁধারি জানালা দিয়ে ঘরেও এসে পড়েছিল। সুতরাং তার কাজের কোন অসুবিধে হবে না। জানালায় গরাদ নেই, উঁকি মেরে বাগানটা তন্ন তন্ন ক'রে দেখে নিল। তারপর জানালার কবাট খুলতেই একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তাকে অভিভূত ক'রে ফেলল। জানালার নীচে দিয়েই একটু সরু রাস্তা, তারপরই বাগান।

বাইরেটা দেখে আবার বিছানার কাছে এসে ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিল, মাথায় টুপি প'রে কোণ থেকে লাঠিগাছটি হাতে নিয়ে জানালার উপর রেখে ফিরে এল।

বিশপ তখন ঘুমে অচেতন, দরজা ভেজান রয়েছে। কান পেতে কি শুনল—ঘরের ভিতর টু শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা গেল না।

সে আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তার বুক তখন ভয়ে দপ্‌দপ্‌ করছিল। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মিনিট খানেক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হতে লাগল, তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে বাড়ীর লোকজন সব

এখুনি জেগে উঠবে। বৃদ্ধ বিশপ তাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন ; বুড়ী ঝি, বিশপের ভগিনী—সকলেই চেঁচিয়ে উঠবেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই গোলমাল শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসবে। দেখতে দেখতে সারা শহরময় একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে, পুলিশ আসবে দলবল নিয়ে। মুহূর্ত্তের জন্যে সে ভাবল তার আর রক্ষা নেই।

পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে একবার কান খাড়া করে কি শুনল। কই, কেউ কোথাও ত নেই। তখন সে বল পেয়ে নিজের কাজ শেষ করবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। কিন্তু তখনও তার বুকের ভিতর টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে শব্দ হচ্ছিল। যাক, নিজেকে সে সামলে নিল।

টেবিলের উপর কাগজ বই ইতস্তত ছড়ান। ঘরের এক পাশে ধোবার-ঘর-থেকে-আসা কাপড়গুলি স্তূপ ক'রে রাখা আছে। ঘরের এখানে সেখানে চেয়ার, টিপয়, ফুলদানি ইত্যাদি সাজান। ভাল্‌জাঁ খুব সাবধানে বাসনের তাকের সামনে এগিয়ে গেল। অপর পাশে বিশপ ঘুমাচ্ছেন, তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভাল্‌জাঁ একবার খাটের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ আগে আকাশ একখণ্ড মেঘে ঢেকে রেখেছিল, হঠাৎ মেঘ কেটে যেতেই ঘর আলোকিত হ'ল। নিষ্পাপ নির্ভীক বিশপ পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন, তাঁর মুখের স্বাভাবিক হাসিটি তখনও মিলিয়ে যায় নি। ভাল্‌জাঁ একবার সেদিকে তাকিয়েই সে মুখের পানে আর তাকাতে পারল না, মুখ ফিরিয়ে নিল।

এবং মুহূর্ত্তকাল কি ভেবে নিয়ে সোজা তাকের সম্মুখে গিয়ে আস্তে আস্তে একটি একটি ক'রে সমস্ত বাসন নিয়ে নিজের ঝোলার মধ্যে রাখল এবং ছড়ি ও ঝোলা নিয়ে লাফিয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল এবং অবিলম্বে পলায়ন করল।

পরদিন প্রাতে বিশপ সূর্য্য-উদয়ের পূর্ব্বে ঘুম থেকে উঠে বাগানে পাইচারী করছিলেন। হঠাৎ ভিতর থেকে বুড়ী ঝি ছুটে এসে বললে, 'হুজুর, হুজুর, তাকের উপর একখানা বাসনও ত দেখতে পাচ্ছি নে! কাল রাতে আপনার সুমুখেই ত সব তাকের উপর সাজিয়ে রেখেছিলাম।'

বিশপ বললেন, 'না, আমি ত জানি নে।'

ঝি চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, 'তাহ'লে কি সব চুরি গেল? হুঁ, ঠিক হয়েছে, কালকের সেই লোকটাই চুরি ক'রে পালিয়েছে। কি বিশ্বাসঘাতক! দেখি লোকটা আছে, না চলে গেছে।'

বলতে বলতে বুড়ী ছুটে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে প্রার্থনা-ঘরের যে জানালা দিয়ে চোর পালিয়েছে সেই জানালার সুমুখে গিয়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠল, 'সেই লোকটাই নিয়ে পালিয়েছে! ওমা, এখন কি হবে! এত ক'রে খাওয়ান হ'ল, আদর ক'রে ভাল বিছানায় শুতে দেওয়া হল, সে-ই কি-না এই সর্ব্বনাশ করলে গা! ওর নরকেও স্থান হবে না।'

বিশপ চুপ করেই ছিলেন, প্রথমটা একটিও কথা বললেন না, পরে বুড়ীর সুমুখে এসে বললেন, 'তুমি যে অত ক'রে বলছ, ও বাসনগুলি কি সত্যই আমাদের? আমরা সন্ন্যেসী, নিজের বলতে

আমাদের কিছু থাকতে নেই। যা আমার নয়, তা এতদিন আমার ব'লে ধ'রে রেখেছিলাম মাত্র। আজ যদি তা নিয়েই গিয়ে থাকে ত বেশ ভালই করেছে, আমায় অন্যের জিনিষ আগলাবার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে। লোকটি আমার হিতৈষী বটে।'

ঝি বিশপের কথার মানে বুঝতে না পেরে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। তখন বিশপ বললেন, 'এসব দামী জিনিষ সবই গরীবদের, যারা খেতে পায় না তাদের। যে নিয়েছে সে-ও গরীব। সুতরাং তার জন্যে আমার আক্ষেপ করা উচিত নয়।'

বিশপের কথাটা বুড়ীর কাছে ভাল লাগল না। সে মনের ভাব গোপন রেখে পুনরায় বললে, 'তা যেন হ'ল। কিন্তু হুজুর, আজ খাবেন কেমন ক'রে? কাঁটা-চামচে পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে।'

'কেন, লোহার কাঁটা চামচে ত আছে, তাই দিয়ে চলবে।'

'কিন্তু তাতে যে খাবার বিস্বাদ লাগবে।'

'তাহ'লে হাতেই খাব। খাই ত দুধ রুটি, তার জন্য অত ভাবনা কিসের? তুমি কিচ্ছু ভেব না।'

'তা যা ভাল বোঝেন করুন, আমার কিন্তু ভাল লাগে না। নিরাশ্রয় গরীব জেনে আশ্রয় দেওয়ার ফল যদি এই হয় ত লোকে আর কাউকে কখনও আশ্রয় দিবে না।'

উৎসাহ না পেয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে বুড়ী নিজের কাজে চলে গেল।

* * * *

বিশপ তখন বসবার-ঘরে বসে একখানা বই দেখছিলেন, এমন সময় সদরের কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

বিশপ বললেন, 'কে?—ভিতরে আসুন।'

সঙ্গে সঙ্গেই ভেজান দরজা ঠেলে জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে করতে তিন-চার জন পাহারাওয়ালা সঙ্গে নিয়ে একজন দারোগা এসে উপস্থিত হ'ল। তাদের সঙ্গে হাত-কড়ি অবস্থায় জঁা ভাল্‌জঁা।

দারোগা ঘরে ঢুকেই মাথার টুপি খুলে বিশপকে নমস্কার করল।

বিশপ তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তার অনুচরদের পানে তাকাতেই বন্দী জঁা ভাল্‌জঁাকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি তার সুমুখে উঠে গিয়ে বললেন, 'এই যে, তোমায় ওরা ধরে এনেছে? দেখা হয়ে ভালই হ'ল। তোমায় যে বাতিদান দুটি দিয়েছিলাম তা নিতে ভুলে গিয়েছ। যাক্‌, এসেছ যখন, তখন সেটি নিয়ে যাও। তার দামও কম হবে না।'

ভাল্‌জঁা একবার বিশপের দিকে এমন ভাবে তাকাল যে তা বর্ণনা করবার মত শক্তি জগতের কোন ভাষায় কোন ব্যক্তির আজ পর্য্যন্ত হয় নি। কিন্তু পরক্ষণেই সে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা বিশপকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'তাহলে ও যা বলেছে, তা সত্যি?—আপনিই ওকে বাসনগুলি দিয়েছেন? আমরা কিন্তু চুরি সন্দেহে ওকে গ্রেফ্‌তার করেছি।'

মৃদু হেসে বিশপ বললেন, 'উনি কি বলেছেন যে একজন

বিশপের বাড়ী উনি রাত্রিবাস করেছিলেন, তিনিই ওকে এসব দিয়েছেন! বেশ বেশ! এর জন্যে ওকে কষ্ট দিয়ে ধরে এনে মহাভুল করেছ।'

দারোগা তখন বললে, 'তাহ'লে কি ওকে ছেড়ে দেব?'

বিশপ বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! তা কি একবার করে বলতে! এখুনি ছেড়ে দাও।'

দারোগার ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালা তৎক্ষণাৎ ভাল্‌জাঁর হাতকড়ি খুলে দিল।

অস্পষ্ট কণ্ঠে জাঁ ভাল্‌জাঁ ব'লে উঠল, 'তা'হলে কি সত্যই আমি ছাড়া পেলাম?'

একটা পাহারাওয়ালা বললে, 'হাঁ। তুমি কি বুঝতে পারনি?'

বিশপ তখন ভাল্‌জাঁকে বললেন, 'যাবার আগে তোমার বাতিদান দুটি নিতে ভুল ক'র না।'

এই ব'লে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে বাতিদান দুটি এনে তার সুমুখে ধ'রে দিলেন।

অদূরে বিশপের বোন ও ঝি বৃদ্ধের কাণ্ডকারখানা নীরবে দেখছিলেন।

ভাল্‌জাঁ পাথরের মূর্ত্তির মত তাকিয়ে রইল, পরক্ষণেই থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়ল। যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে বাতিদান দুটি কুড়িয়ে নিল।

তখন বিশপ তাকে বললেন, 'এখন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও। আর এক কথা, যদি কখনও এ বাড়ীতে আসার প্রয়োজন হয় ত

বাগান ঘুরে আসার কোনই দরকার নেই। আমার দরজা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে।'

তারপর দারোগার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এখন যেতে পার।'

তারা আর একবার বিশপকে সেলাম ক'রে ঘরের বার হয়ে গেল।

ভাল্‌জাঁর মাথাটা ঘুরে উঠল, সে যেন নিশ্বাস নিতে পারছে না, তার মনে হচ্ছিল, বুঝি-বা সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে।

বিশপ তার সুমুখে গিয়ে তার দুটি হাত ধরে নীচু গলায় বললেন, জাঁ ভাল্‌জাঁ, ভাই আমার, এখন থেকে তুমি আর শয়তানের অনুচর নও, এখন তুমি ভগবানের। শয়তানের কাছ থেকে তোমার আত্মাকে আমি কিনে নিয়ে ভগবানের পায়ে অর্পণ করে দিয়েছি।'

ভাল্‌জাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হ'ল না, সে নীরবে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ীর বার হয়ে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জেয়রভে

জাঁ ভাল্‌জাঁ উর্দ্ধশ্বাসে শহর পরিত্যাগ ক'রে গেল। যেমন ক'রে হোক্, যত শীঘ্র সম্ভব সে খোলা মাঠে এসে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচতে চায়। শহরে যেন তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কোন্ পথে গেলে সে তার বাঞ্ছিত স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে তা তাব জানা ছিল না। সুমুখে যে রাস্তা পায় সেই রাস্তা ধরেই সে এগিয়ে চলল। সারা সকাল বেলাটা সে এমনি ক'রে ঘুরে মরল। সকাল থেকে একটি দানাও পেটে পড়ে নি, তার খাওয়ার ইচ্ছেটাই যেন চলে গেছে। মনে মনে কত ভাবই যে আসছিল। এ তার কি হ'ল, জয়?—না, পরাজয়? সময় সময় তার মধ্যে যে সত্যিকার মানুষটি বিশ বছরের অবিচারে অত্যাচারে জীবন্মৃত হয়ে ছিল, সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। এক-একবার তার মনে হচ্ছিল, এর চাইতে জেলখানাও ঢের ভাল ঢের আরামের, অন্যায় করলে পাহারাওয়ালা তখুনি শাস্তি দেয়, নিয়মমত খাওয়া, শোয়া, খাটুনি—সব নিয়মে বাঁধা।

এখানে সেখানে দু-একটা মরসুমি ফুল তখনও ফুটে ছিল, তাদের গন্ধে তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলার কথা সে যেন সহ্য করতে পারছিল না।

সারাদিন সে পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল। কত

কথাই তার মনে হ'ল। তার সেই প্রথম অপরাধ,—পেটের দায়ে ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে একটুক্‌রা রুটি চুরি, সেই সামান্য অপরাধে কঠোর শাস্তি, উনিশ বছর জেলখানায় বাস! জেলে সেই অকথ্য অত্যাচার; দুঃখে কষ্টে সে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাল, মানুষের মনুষ্যত্বে পর্য্যন্ত তার অবিশ্বাস জন্মাল। তারপর বিশপের এই দয়া,—একে একে সব কথা মনে পড়ে সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠল।

সূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়, ভাল্‌জাঁ ঘুরতে ঘুরতে এক তেপান্তরের মাঠে এসে উপস্থিত হয়ে এক উচুঁ ঢিবির ওপর শ্রান্তক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। যতদূর দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছয়, তার মধ্যে কোন দিকেই লোকজনের বসতি দেখা যায় না।

অদূরে কে একজন আপন মনে গান গাইতে গাইতে আসছিল। মাথা তুলে ভাল্‌জাঁ দেখলে এক বালক আসছে, হাতে তার বেহালার মত একটা বাদ্যযন্ত্র, পিঠে একটা বাক্স ঝুলান। এই বালক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গান গেয়ে, নানাপ্রকার তামাসা দেখিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করে, এই তার পেশা।

বালকটি ভাল্‌জাঁকে দেখতে পায়নি, ঝোপের ওপাশে এসে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। বসে বসে ভাল লাগছিল না। কি মনে ক'রে পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে সে তুড়ি মেরে সেটি উপরে ছুঁড়ে দিয়ে খেলা করতে লাগল। একবার আধুলিটা গড়িয়ে এসে ভাল্‌জাঁর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল। ভাল্‌জাঁও আধুলিটি জুতা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল। কিন্তু

বালক আধুলিটির গতির দিকে নজর রেখেছিল এবং ভাল্‌জাঁ যে পায়ে চেপে রাখল তাও তার নজর এড়ায় নি। সে সোজা তার কাছে এসে দাঁড়াল।

জায়গাটা যে তেপান্তরের মাঠ তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, সুমুখে লোকালয় ত দূরের কথা, লোকজনের সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না।

ভাল্‌জাঁর সুমুখে এসে বালক বললে, 'মশাই, আমার আধুলিটি?'

ভাল্‌জাঁ তাকে শুধাল, নাম কি 'তোমার?'

'আমার নাম জেয়রভে।'

ভাল্‌জাঁ বলে উঠল, 'ভাগ্ এখান থেকে যদি ভাল চাস্, নইলে—'

'ভাগছি, কিন্তু দয়া ক'রে আমার আধুলিটি দিন।'

জাঁ ভাল্‌জাঁ মাথা নীচু করল, কিন্তু কিছু বলল না।

ছেলেটি আবার বলল, 'আমার আধুলি দিন, আমি চলে যাই। আমার বড় দুঃখের পয়সা।'

ভাল্‌জাঁ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

বালক পুনরায় বলল, 'কই মশাই, দিন্, আমার আধুলিটি দিন।'

ভাল্‌জাঁ যেন বালকের কথার অর্থ বুঝতে পারছিল না, হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইল। বালক ইতিমধ্যে ভাল্‌জাঁর জামার খুঁট ধরে টান দিল এই মতলবে যে, হয় ত তার ফলে

পরে লাঠি তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'কে ?'

ভাল্জাঁ পা সরাবে, আর সেই ফাঁকে আধুলিটি চট্ ক'রে তুলে নিয়ে সে পালাবে।

'বা রে, আমার আধুলিটা দিচ্ছেন না কেন মশাই ?'

বালক কেঁদে উঠল।

ভাল্জাঁ তখন মাথা তুলে তার দিকে তাকাল। তখনও সে ঢিবির ওপর বসেছিল, তার চোখ দুটি অস্পষ্ট। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে বালকের দিকে তাকাল, পরে লাঠিগাছটি তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'কে ?'

'আমি।'

'আমি কে, কি চাও ?'

'আমি জেয়রভে। আমার আধুলিটি চাইছি। পা'টা একটু সরালেই আমি আধুলিটি নিতে পারি।'

বালক বয়সে ছেলেমানুষ হ'লেও ভাল্জাঁর আচরণে রেগে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আপনি পা সরাবেন না তাহ'লে ?'

ভাল্জাঁ বিরক্তির সঙ্গে ব'লে উঠল, 'আঃ, তুমি এখনও এখানে রয়েছ ? যাবে না !'

বালক তার দিকে সভয়ে তাকাল। এবং কাঁপতে কাঁপতে তখুনি ছুটতে লাগল। ভয়ে সে বিবর্ণ হয়ে গেছে, চেঁচাবার বা কাঁদবার শক্তিও তার লোপ পেয়ে গেছে। সে যে কোথায় কোন্ দিকে ছুটেছে তার কিছুমাত্র খেয়াল নেই। একদৌড়ে অনেকটা দূরে এসে দম নেবার জন্যে তাকে থামতে হ'ল। এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে কোথায় সে অন্তর্ধান করলে।

সূর্য্য তখন অস্ত গেছে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। সারাদিন ভাল্‌জাঁ কিছু খায় নি, রোদে রোদে পাগলের মত ঘুরে তার একটু জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে। একই অবস্থায় খানিকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, একবারও নড়ল না, বা চোখ ফেরাল না—তার দৃষ্টি যেন দূরের একটা ভাঙা কলসীর দিকেই একান্তভাবে বদ্ধ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল, মাঠের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শীত বোধ হচ্ছে। মাথার টুপিটা ঠিক ক'রে প'রে জামার বোতাম এঁটে দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে লাঠি গাছটি তুলে নিতে গেল।

হঠাৎ পায়ের কাছে একটি চক্‌চকে আধুলি দেখতে পেল। পায়ের চাপে সেটি ঘাসের মধ্যে অনেকটা মিশে গেছল। আধুলিটার দিকে নজর পড়তেই সে আপন মনে ব'লে উঠল, 'ওটা কি ?'

তিন-পা পিছনে হটে সে ফিরে দাঁড়াল। যেখানটায় তার পা ছিল সে দিক থেকে সে তার দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। চক্‌চকে আধুলিটা যেন এখন ছাড়া পেয়ে তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি ভেবে সে এগিয়ে গেল এবং কম্পিত হস্তে আধুলিটি তুলে চারদিক তাকাতে লাগল।

কিছু সে দেখতে পেল না। রাত ঘনিয়ে আসছে, মাঠে শীত জমে আসছে, চারদিক কুয়াশায় ঢেকে গেছে। সে একটা দিক লক্ষ্য ক'রে হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে যেতে সুরু করল, এই দিকেই ছেলেটি চলে গেছে। ষাট-সত্তর হাত গিয়ে সামনের দিকে একবার তাকাল কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। তারপর

যত জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল,—জেয়রভে ! জেয়রভে !'

তখুনি আবার চুপ ক'রে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেল না। লোকজন কোথাও নেই, কিছু নেই। অমন অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না, অমন নীরবতায় মানুষের সাড়া হারিয়ে যায়। বাতাসের সঙ্গে কন্‌কনে শীত এসে তাকে পাগল ক'রে দিল। চারিদিকেই যেন একটা বিষাদের রাজত্ব—ছোট ছোট গাছপালাগুলি যেন তাকে ভয় দেখাচ্ছে।

আবার সে হাঁটতে সুরু ক'রে দিল, জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে সে থামল এবং চীৎকার করে ডাকতে লাগল,—জেয়রভে ! ও জেয়রভে ! তার স্বরে একটা ব্যাকুলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। বালক তার ডাক শুনলেও সম্ভবত ভয়ে সাড়া দেয় নি। আর ইতিমধ্যে সে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে নিশ্চয়।

ইতিমধ্যে তার সঙ্গে এক পুরোহিতের দেখা হ'ল। তিনি ঘোড়ায় চ'ড়ে আসছিলেন। ভাল্‌জাঁ তাঁর সুমুখে গিয়ে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, দেখুন, এ পথে একটি বছর দশেকের ছেলেকে যেতে দেখেছেন ?'

'না।'

'ছেলেটির নাম জেয়রভে।'

'হবে, কিন্তু আমি কাউকে দেখি নি।'

ভাল্‌জাঁ তার জামার পকেট থেকে দুটি টাকা বার ক'রে পুরোহিতের হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার গরীবদের দিবেন। ছেলেটির বয়স বছর দশ হবে, পিঠে একটি কাঠের বাক্স, হাতে বেহালার মত একটি বাদ্যযন্ত্র।'

'না, আমি তাকে দেখি নি।'

'আচ্ছা, কাছাকাছি কোন গ্রামে জেয়রভে নামে কেউ থাকে ?'

'আমার মনে হয়, তুমি যার কথা বলছ, সে এখানকার বাসিন্দা নয়। পথ-চলতি কেউ হবে। এ পথে অনেকেই ওরকম আসা-যাওয়া করে কি-না।'

হঠাৎ ভাল্‌জাঁ পকেটের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে আরও দুটি টাকা বার ক'রে পুরোহিতের হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার গরীবদের জন্যে।'

পরক্ষণেই আবার পাগলের মত ব'লে উঠল, 'পুরোহিত মশাই, আমায় গ্রেফ্‌তার করুন, আমি চোর, ডাকাত!'

পুরোহিত মশাই পাগলের সঙ্গে বাক্যালাপ করে মাঠের মাঝে সময় নষ্ট করতে চান না, ঘোড়াকে চাবুক মেরে ছুটিয়ে দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জাঁ ভাল্‌জাঁও যেদিকে প্রথম যাচ্ছিল সেই দিকেই ছুটতে লাগল। অনেক দূর এগিয়ে গেল, চারদিকে তার দৃষ্টি, সে চীৎকার ক'রে বালককে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছিল। কিন্তু আর কারুর সঙ্গেই তার দেখা হ'ল না। ছোট ছোট গাছপালা দেখে ভুল ক'রে সে দু-তিন বার ছুটে গিয়েছে। কিন্তু

কাউকে দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে পথ ধরেছে।

তারপর সে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে তিনটা রাস্তার মোড়। আকাশে চাঁদ উঠেছে, আর একবার সে বালকের নাম ধ'রে ডেকে উঠল। কুয়াশায় তার স্বর মিলিয়ে গেল, প্রতিধ্বনিও হ'ল না। সে পুনরায় আস্তে আস্তে অস্পষ্ট জড়িত স্বরে ডাকল,—জেয়রভে!

আর সে পারে না। পা দুখানা আর তার দেহকে বইতে পারছিল না, হাঁটু ধ'রে এসেছে। সে একখানা বড় পাথরের উপর বসে পড়ল। অনুতাপে, দুঃখে, অভিমানে সে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল, আর আপন মনেই ব'লে উঠল, 'আমি একটা বদ্‌মায়েশ!' তারপর সে কি কান্না! উনিশ বছর বাদ আজ প্রথম সে প্রাণভরে কাঁদল।

•

জাঁ ভালজাঁ যখন বিশপের বাড়ী থেকে একদম মুক্তি পেল তখন তার যে মনের ভাব ছিল এখন আর সে ভাবটি তার মনের কোণেও খুঁজে পাচ্ছিল না, এবং তার মনের এ পরিবর্ত্তনের কোন কারণই সে বুঝতে পারছিল না। বিশপ তার প্রতি যে অসীম করুণা দেখিয়ে তার মন গলিয়েছিলেন, হঠাৎ কেন সে তার মনকে শক্ত করল। বৃদ্ধের কথাগুলি তার মনে পড়ল, 'তুমি অতঃপর সাধু জীবন যাপন করবে আমায় কথা দিয়েছ। আমি শয়তানের কাছ থেকে তোমার আত্মাকে কিনে নিয়ে

ভগবানের পায়ে সমর্পণ করেছি।' কথাটা বার বার তার মনে হতে লাগল। পাপ ক'রেও ভগবানের করুণা পেলে পাপীর মনে একটা অহঙ্কার আসা স্বাভাবিক এবং সেই অহঙ্কার থেকেই সে নিত্য নতুন পাপ কাজ করবার প্রশ্রয় পায়। তাই বিশপের সে করুণার কথা মনে হতেই তার চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার মনে হ'ল যে, বিশপ তাকে মার্জ্জনা ক'রে যে করুণা দেখালেন তার মত আঘাত সে জীবনে কখনও পায় নি। সুতরাং তাঁর করুণা দয়া দাক্ষিণ্যকে সে যতই অস্বীকার করতে পারবে ততই তার চিত্ত শক্ত থাকবে। যদি সে তা না করে, কোন সময় স্বীকার ক'রে বসে তাহ'লে এতকাল মানুষের অবিচার অন্যায় সহ্য ক'রে মনুষ্যজাতির প্রতি তার যে একটা বিদ্বেষভাব সে লালন ক'রে তৃপ্তি পেয়েছে তা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। এবারে হয় সে জয় করবে, নতুবা চিরজীবনের মত দেউলে হয়ে যাবে। এমনই ধারা নানা বিরুদ্ধ ভাব এসে অন্তরে তার একটা দেবাসুরের লড়াই বাধিয়ে দিল।

এমনই ধারা ভাল-মন্দ ভাবতে ভাবতে সে মাতালের মত পথ চলতে লাগল। এ শহর থেকে যে কাণ্ডটা করে সে চলেছে তার ফল তার জীবনে কি পরিবর্ত্তন এনে দিবে সে সম্বন্ধে তার মনে অস্পষ্ট ধারণাও কি ছিল? মানুষের জীবনের এক একটা সময়ে মনে যে ভালমন্দর প্রেরণা আসে তা কি তার জীবনেও আসবে? এবারে যদি সে নিজেকে শোধরাতে

চেষ্টা করে তাহ'লে সে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ মানুষ হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করবে; আর যদি আবার বিপথে পা বাড়িয়ে দেয় ত এমন নীচে নামবে যে আর উঠবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। হয় তাকে চরিত্রবলে তার মুক্তিদাতা বিশপের চাইতে বড় হতে হবে, নয় ত দুনিয়ার সব চাইতে নিকৃষ্টতম প্রাণী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে; সে যদি ভাল হতে চায় ত দেবতা হতে পারে, আবার যদি শয়তান হতে চায় ত তার পথও প্রশস্ত।

সে কি সত্য সত্যই এ সব ভাবতে পারে? সত্য বটে দুঃখে না পড়লে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি খোলে না, কিন্তু তবু কি এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমরা যে রকম ভালমন্দের পার্থক্য বিচার করলাম ভাল্‌জাঁরও সেরূপ করবার ক্ষমতা আছে? যদি মুহূর্ত্তের জন্যেও তার চিত্তে এরূপ বিচার করবার প্রবৃত্তি জেগে থাকে তাহ'লে তার অন্তরের সে অব্যক্ত দুঃখগ্লানির ভারে সে যে একেবারে নুয়ে পড়বে।

ভবিষ্যৎ জীবনের বিশুদ্ধ শান্তির জন্য তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল, এবং কি ভাবে কেমন ক'রে সে পথ চলবে তাই তার ভাবনা হ'ল।

একটা জিনিষ সেও নিজে ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, সে আর ঠিক আগেকার মানুষটি নেই, তার মনের অনেক বদল হয়ে গেছে। বিশপের প্রভাব থেকে তার আর এড়াবার এতটুকু শক্তিও নেই। এ সত্য আজ স্পষ্ট ক'রেই সে বুঝতে পেরেছে।

মনের যখন তার এই অবস্থা ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বালক জেয়রভের সঙ্গে তার দেখা এবং কেমন ক'রে বালকের আধুলিটি সে আত্মসাৎ করেছে তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এ কাজ সে কেন করল তার নিশ্চয় কোন হেতুই সে দেখাতে পারবে না। সুদীর্ঘ উনিশ বছর পর কয়েদ খেটে কি এই প্রবৃত্তিটি সে আয়ত্ত করে এনেছে? আমরা কিন্তু তা বলতে পারব না। আমরা বলব, সে এ কাজ করেনি, করেছে তার মধ্যে যে একটা পশু, একটা শয়তান এতদিন বাসা বেঁধেছিল—সে। নয় ত সে তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল।

কারণ যাই হোক, তার মনুষ্যত্ব তখন পশুশক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। আবার যখন তার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এল, সে তার কৃতকার্য্যের জন্যে অনুতপ্ত হ'ল, ভয়ে ভাবনায় মুষড়ে পড়ল। তার চুরি করবার ক্ষমতা আর নেই, সে শক্তি তার চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে; তার সত্যতা বালকের আধুলিটি গ্রহণ করাতেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

অন্যায় কাজের প্রতি তার একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এসে গেল এবং তা এমন ভাবেই এল যে, তাকে এড়াবার আর এতটুকু ফাঁক ও কোন দিক দিয়ে আর রইল না। সে প্রাণপণ চেষ্টায় বালককে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তাকে পেলে তার আধুলিটি ত দিবেই, তাছাড়া ক্ষতিপূরণও করবে। এবং বহু চেষ্টা ক'রেও যখন বালকের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, তখন হতাশ হয়ে সে বসে পড়ল। তখনও তার ঝোলার মধ্যে বিশপের বাড়ীর

চোরাই বাসনপত্রগুলি রয়েছে—মনে তার কত বিচিত্র ভাব আসা-যাওয়া করতে লাগল।

সারা জীবন অবিচার অত্যাচার সয়ে সয়ে আজ সে খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

তার সুমুখে একবার জা ভাল্‌জা তার কদর্য্যতা নিয়ে এসে দাঁড়াল। একে দেখে সে ভয়ে আঁতকে উঠল। সে আর চোখ মেলে তাকাতে পারল না,—দু হাতে চোখ ঢেকে রইল। পরক্ষণেই আবার যাকে দূরে—অতি দূরে মশালের আলো বলে এগিয়ে যাচ্ছিল, এখন দেখতে পেলে সে মশাল নয়,– একটা অতি ক্ষীণ আলোর শিখা মাত্র। এবং সে আলোর শিখার পানে ভাল করে তাকাতেই সে বুঝতে পারল, সে শিখা আর কিছুই নয়,—সে স্বয়ং বিশপ।

দেখতে দেখতে সে ক্ষীণ শিখা বিরাট মশালের মত জ্বলে উঠে গহন আঁধারে তাকে যেন পথ দেখাতে লাগল।

তার সুমুখে তখন দুটি লোক,—এক বিশপ, অপর জঁা ভাল্‌জঁা।

এমনই ক'রে তার চিত্ত আলোড়িত হতে লাগল এবং যতই সে বিশপের কথা ভাবতে লাগল ততই বিশপ তার চোখে অধিকতর মহনীয় হয়ে উঠতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই জঁা ভাল্‌জঁা দূরে সরে যেতে লাগল, এবং অবিলম্বে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তার মন থেকে মুছে গেল। অবশেষে জঁা ভাল্‌জঁার অন্তর্ধানে বিশপ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এই আজন্ম হতভাগ্যের

অন্তরের সকল গ্লানি সকল দুঃখ নিঃশেষে মুছে দিয়ে তাকে আলোর পথে চালিত করলেন।

জাঁ ভাল্‌জাঁ অনেকক্ষণ কাঁদল। কেঁদে তার মনের গ্লানি আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। তার গতজীবন, তার প্রথম অপরাধ, দীর্ঘকাল ধ'রে তার সে প্রায়শ্চিত্ত, তার বাহ্যিক পশুত্ব, তার ভিতরের দৃঢ়তা, তার মুক্তি, বিশপের করুণা সর্ব্বশেষে বালকের আধুলি আত্মসাৎ—সব কিছু একে একে বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠল এবং এতে ক'রে সে যে রকম তৃপ্তি পেল জীবনে কখনও তা পায় নি। তার গত জীবনের পানে তাকিয়ে সে ভয়ে শিউরে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বাঁচল, কেন-না, আজ সে শয়তানকে মহতের দৃষ্টি দিয়ে দেখবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছে।

কতক্ষণ সে কেঁদেছিল, সে কি করল, কোথায় গেল,—কেউ তা জানতে পারল না। কেউ কেউ বলে যে, সেই দিনই রাত তিনটার সময় ডাকগাড়ী যখন বিশপের বাড়ীর সামনে দিয়ে যায় তখন কে নাকি একটা লোক হাঁটু গেড়ে দূর থেকে কাকে প্রণাম নিবেদন করতে দেখেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফাদার মাদ্‌লেন

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের অদূরে একটি ছোট্ট শহরের নাম এম্-স্যুর-এম্। বহুকাল থেকেই এখানে আসল চুনীর নকলে একপ্রকার সস্তা কালো জিনিষ তৈরির কারবার চলে আসছিল এবং অনেকেই সেই কারবারে বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। এ সব সস্তা চুণী ইউরোপের মেয়েরা অলঙ্কারে ব্যবহার করত। খাঁটি পাথরের দাম অনেক, তাই সাধারণের পক্ষে তার ব্যবহার সম্ভব ছিল না।

১৮১৫ সালের শেষাশেষী একজন নতুন লোক এসে এই শহরে বসবাস সুরু করেন। তিনি সামান্য মূলধন নিয়ে এই কারবার আরম্ভ করেন এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও একটি নতুন রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্যবসায়ে যুগান্তর এনে দিলেন। তাঁর কারখানায় তৈরি চুণী এত সুন্দর যে আসল চুণীও তার কাছে হার মেনে যায় এবং পাকা মণিকারও সময় সময় তা আসল কি নকল ধরতে পারত না। অথচ জিনিষের দাম যেমন তিনি কমিয়ে দিলেন, জিনিষও তেমনি ভাল হ'তে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদের মজুরিও সেই অনুপাতে অনেক বেড়ে গেল। ফলে ছোট শহরটির চেহারা দেখতে দেখতে বদলে গেল।

লোকটি বছর তিনেকের মধ্যেই দস্তুর মত বড়লোক হয়ে পড়লেন। এবং তাঁর সঙ্গে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের অবস্থাও ঢের ভাল হ'ল। এ ব্যবসায়ে তিনি নতুন, এর আগে তিনি কোথায় ছিলেন, কি করতেন—কেউ তা জানে না। এবং কেমন ক'রে যে তিনি এ কারবারে প্রথম ঢুকলেন এবং আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যবসা একচেটিয়া করে নিলেন তা সকলেরই অজানা। লোকে বলে, তিনি যখন এ শহরে আসেন তখন তাঁর টাকা-পয়সা বড় বিশেষ কিছু ছিল না, অন্তত এত বড় কারবার করবার মত প্রচুর অর্থ তাঁর যে ছিল না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে আসার সময় তাঁর সাজপোষাক ছিল নেহাৎ শ্রমিকের মত। কিন্তু তাই ব'লে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এতটুকুও বদল হ'ল না। এক শীতের রাত্রিতে এসে তিনি উপস্থিত হন। পিঠে ছিল তার মস্ত বড় একটা ঝোলা, হাতে একগাছা মোটা লাঠি। সে রাত্তিরে টাউন হলে কেমন ক'রে যেন আগুন লাগে। এই লোকটি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে পুলিশের বড় কর্ত্তার ছেলে দুটিকে বাঁচাবার জন্যে লক্‌লকে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের জীবন উদ্ধার করলেন। সুতরাং এহেন পরোপকারীর সম্বন্ধে কেউ কোন অসঙ্গত প্রশ্ন করার কথা ভাবতেই পারে নি। এই ব্যাপারেই লোকে তাঁর নাম জানতে পারল, তিনি তাঁর নাম বললেন—ফাদার মাদ্‌লেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথার চুলে দস্তুর মত পাক ধরেছে, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে, মন চিন্তায় আকুল, মুখ প্রশান্ত। তিনি লোকের সঙ্গে বেশী মেশেন না।

চালে চলেন নেহাৎ সাদাসিধা। সকালে বিকালে বেড়ানটা তাঁর মস্ত সখ।

তাঁর আসার আগে শহরের সব কিছুই যেন ছিল প্রাণহীন, কিন্তু এখন যেন নবজীবন লাভ করল। তাঁর ব্যবসা পরিচালনায় এত কৃতিত্ব যে, ইউরোপের কোথাও তার পণ্যদ্রব্যের প্রচার বাকী ছিল না। লোকের দুঃখ কষ্ট অনেকখানি দূর হ'ল। সকলেরই কিছু-না-কিছু সঞ্চয় থাকত, গৃহহীন নিরাশ্রয় তাঁর কাছে আশ্রয় পেত। ছেলে-মেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তাঁর এতটুকু কৃপণতা ছিল না।

কারবারে অত অত টাকা রোজগার করেও তাঁর মনের কিছুমাত্র বদল হয় নি, নিজের জন্যে তিনি এতটুকু ভাবতেন না,—ভাবনা তাঁর যা-কিছু সবই পরের জন্যে। বছর পাঁচেকের মধ্যেই তিনি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা জমিয়ে ফেললেন। এই থেকেই বোঝা যাবে যে, তিনি কত টাকা রোজগার করেছিলেন। শহরের সকল প্রকার উন্নতি ও দরিদ্রদের সাহায্যের জন্যে এর দ্বিগুণেরও বেশী তিনি ব্যয় করেছেন। শহরের হাসপাতাল এতদিন অর্থাভাবে প্রায়-অচল হয়ে পড়েছিল, তাঁর সাহায্যে তা আবার সচল হয়ে উঠল। এবং আরও দশটি রোগীর থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

শহরটি দু'ভাগে বিভক্ত। তিনি যে ভাগে বাস করতেন সে অঞ্চলে একটি ভাঙা জীর্ণ বাড়িতে নামমাত্র একটি স্কুল ছিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে দুটি পাকা বাড়ী তৈরি করিয়ে দুটি স্কুল স্থাপন

করলেন,—একটি ছেলেদের, আরটি মেয়েদের জন্যে। সরকারের সাহায্য থেকে শিক্ষকেরা সামান্য মাইনে পেতেন, সুতরাং পড়াশুনার কাজে তাঁদের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। তিনি তাঁদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে টাকাটা নিজেই দিতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলতেন, 'দেশের জন্যে দুটি জিনিষ সর্ব্বাগ্রে চাই,—নার্স, আর শিক্ষক।'

ফাদার মাদ্‌লেন নিজের ব্যয়ে বৃদ্ধ ও পঙ্গু শ্রমিকের সাহায্যের জন্যে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করলেন। শ্রমিকদের জন্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করলেন।

প্রথম প্রথম লোকেরা বলত, লোকটা নিজে বড়লোক হতে চায়। কিন্তু পরে যখন তারা দেখল যে, তাঁর বড়লোক হাওয়ার মানেই হচ্ছে শহরসুদ্ধ সবাইকে বড়লোক করা, তখন তারাই আবার বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা উচ্চাভিলাষী।'

এদিকে ১৮১৫ সালে শহরের সর্ব্বত্র গুজব রটে গেল যে, দেশের উন্নতির জন্যে তিনি যা করছেন তার জন্যে রাজা তাঁকে শীঘ্রই এম্—শহরের মেয়রের পদে মনোনীত করছেন। যারা তাঁকে উচ্চাভিলাষী বলেছিল—তারা এবার বলতে লাগল, কেমন, বলি নি আমরা!

দেখতে দেখতে গুজব সত্যি হয়ে গেল। সরকারী গেজেটে খবরটা বার হ'ল। এবং পরদিনই তিনি এই সম্মান গ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে মেয়রের পদ প্রত্যাখ্যান করলেন।

সে বছরের শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি প্রদর্শিত

হ'ল এবং বিশেষজ্ঞদের সুপারিশে রাজা তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করলেন। এ সব কারণে ছোট্ট শহরটিতে ভারী চাঞ্চল্য দেখা গেল। কেউ কেউ বলতে লাগল, 'লোকটার কি দেমাক, মেয়রের পদেও খুশী হতে পারল না, ও ক্রশ চায়!' কিন্তু তিনি যখন ক্রশ গ্রহণেও রাজী হলেন না, তখন দেশের নরনারী তাঁকে একটা প্রহেলিকা বলেই মনে করল।

দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে তিনি অনেক কিছুই করেছিলেন, বিশেষ ক'রে গরীবদের ত কথাই নেই। তাঁর অবসর এত কম ছিল যে, তিনি সম্মান গ্রহণেরও সময় পেতেন না ; তাঁর ব্যবহার এত নম্র এত ভদ্র যে, তাঁকে ভাল না বেসে কেউ পারত না ; তাঁর কারখানার শ্রমিকেরা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি করত। এবং তাঁদের এ শ্রদ্ধাভক্তি তিনি একটা বিষণ্ণগাম্ভীর্য্যে গ্রহণ করতেন। লোকে যখন তাঁকে বড়লোক বলে জানল, সমাজেও তখন তাঁর সম্মানের সীমা রইল না। তারা তাঁকে মঁসিয়ে মাদ্‌লেন বলে সম্বোধন করতে লাগল। তবে তাঁর আশ্রিত শ্রমিকের দল ও ছেলেমেয়েরা তাঁকে ফাদার মাদ্‌লেন বলেই ডাকত। এবং তাদের এ ডাকে তিনি বড় খুশী হতেন।

ক্রমে চারদিক থেকে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। সমাজে তাঁর একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা হ'ল। যে বৈঠকখানা-ঘরে আগে কারিগরেরা বসে কর্ত্তার সঙ্গে কারবার সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করত, সেখানে এখন দেশের বড় বড় লক্ষপতিদের আনাগোনা সুরু হ'ল। কত লোক তাঁর কারবারে টাকা খাটাবার জন্যে

নিজের নিজের টাকা তাঁকে দিতে রাজী হ'ল কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে গররাজী হলেন। এ সম্পর্কেও লোকেরা বলাবলি করত, 'লোকটা বোঝে না কিছু, তার উপর লেখাপড়ায় ত মা-গঙ্গা; কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর, এতদিন ও কোথায় ছিল, কি করত, কেউ তা জানে না। ভদ্রসমাজে ওর জায়গা কোথায়?' তিনি যখন প্রচুর টাকা রোজগার করতে লাগলেন তখন তারা বলত, 'লোকটা খাঁটি ব্যবসাদার!' তিনি যখন দু হাতে গরীব-দুঃখীকে দান করতেন, লোকের হিতের জন্যে প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন তখন তারাই আবার বলত, 'লোকটা বড় হতেই চায়।' আবার যখন রাজার দেওয়া সম্মান নিতে অসম্মত হলেন তখন তারা বলতে লাগল, 'লোকটা খেয়ালী!' আবার যখন সৌখিনতাকে তিনি এড়িয়ে চলতেন তখন তারা বলত, 'লোকটা একেবারে অসভ্য বর্ব্বর! ভদ্রতা জানে না!'

দেখতে দেখতে বছর পাঁচেক কেটে গেল। ইতিমধ্যে দেশের কল্যাণের জন্যে তিনি অনেক কিছুই করেছেন। রাজা এবার দেশের সকলকার সম্মতিতে তাঁকে পুনরায় এম্— শহরের মেয়র নিযুক্ত করলেন, এবারেও তিনি তা গ্রহণ করতে গররাজী হলেন। কিন্তু শাসনকর্ত্তা তা গ্রাহ্য করলেন না। দেশের বড় বড় লোক এসে তাঁকে অনুরোধ জানালেন, সাধারণ লোকেরা তাঁর কারখানা-বাড়ীর সামনে রাস্তায় সমবেত হয়ে তাঁকে উপরোধ করতে লাগল। অগত্যা তখন নিরুপায় হয়ে তিনি রাজী হলেন।

এত সম্মান, এত টাকাকড়ি—কিছুতেই তাঁর মনের এতটুকু পরিবর্ত্তন আনতে পারল না। তাঁর মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছে, স্থির দৃষ্টি, পাথরে খোদা শ্রমিকের মূর্ত্তির মত গাম্ভীর্য্যময় মুখমণ্ডল এবং দার্শনিকের মত চিন্তাশীল আকৃতি—তাঁকে বড় মানাত। একটা মোটা টুপি ও সাধারণ মোটা কাপড়ের একটা লম্বা কোট, তাতে আগাগোড়া গলা পর্য্যন্ত বোতাম। মেয়রের নির্দ্দিষ্ট কাজটুকু নীরবে শেষ ক'রে একাকী থাকতেই তিনি পছন্দ করেন। কথাবার্ত্তা তিনি বেশী কইতে ভালবাসেন না এবং নিজের প্রশংসা শুনবার আগ্রহও তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। যখন হাসতেন, প্রাণ খুলেই হাসতেন। তিনি খোলা মাঠে একা বেড়াতে ভারী পছন্দ করতেন। খাবার সময় বই পড়া তাঁর একটা সখ। নিজের একটা ছোটখাট বাছাই-করা বইয়ের সংগ্রহ ছিল। বই তিনি বড় ভালবাসতেন, কেন-না, তারা কথার জবাব দিতে না পারলেও তাদের বন্ধুত্বে এতটুকু খাদ নেই। প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে খাটুনি অনেকটা কমে ছিল বটে কিন্তু অবসর সময়টা তিনি জ্ঞানার্জ্জনেই কাটাতেন। যতই দিন যেতে লাগল ততই তাঁর ব্যবহার অধিকতর ভদ্র, নম্র ও অমায়িক হতে লাগল।

বেড়াবার সময় তিনি সব সময়ই একটি বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যেতেন, কিন্তু কখনও বড়-একটা ব্যবহার করতেন না। তবে যখন ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ত তখন তাঁর লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হত না। তিনি কখনও নিরীহ প্রাণী বা ক্ষুদ্র পাখী হত্যা করেন নি।

বয়স তাঁর অনেক হ'লেও দেহে অসুরের মত বল ছিল। সাহায্য-প্রার্থী কখনও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে শূন্য হাতে ফেরে নি। বড় হয়েও মেহনতের কাজ করতে তাঁর মনে কোন সঙ্কোচ ছিল না। রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে দেখলেন, কারুর ঘোড়া পড়ে গেছে, তিনি গিয়ে তুলে দিয়েছেন; কারুর গাড়ীর চাকা কাঁচা মাটির রাস্তায় কাদায় বসে গেছে, তিনি তখুনি ছুটে গিয়ে কাঁধ দিয়ে তুলে দিয়েছেন; ক্ষ্যাপা বলদ ছুটেছে, কেউ ধরতে পারছে না, তিনি সটান্ এগিয়ে গিয়ে অনায়াসেই তার শিং দুটি ধ'রে তাকে হেলায় আটক করেছেন। বেড়াবার সময় পকেট ভর্ত্তি ক'রে পয়সা ও একআনি নিয়ে বার হতেন এবং বাড়ী ফিরতেন খালি হাতে। গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গেলে গরীব ছেলেমেয়েরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত। এতদিন যে তিনি গ্রামেই বাস করে এসেছেন, তিনি যে গ্রাম্য লোকই তা তাঁর আচরণেই ধরা পড়ত। কেন-না, গ্রাম্য লোকের মত তিনি অনেক বিষয়ই জানতেন এবং আবশ্যক মত উপদেশ বিতরণ করতেন। চাষীরা তাঁর উপদেশে শস্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং প্রচুর শস্য উৎপাদন করতে পারত। তিনি সকল সময়ই বলতেন, 'দুনিয়ায় কিছুই খারাপ নয়, কেউ খারাপ নয়—আসলে অবস্থানুসারে খারাপ হয়।'

ছেলেমেয়েরা তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসত, কেন-না, তাদের খুশী করবার মত খেলনা, খাবার ইত্যাদি সব সময়ই জোগাতেন। প্রতিবেশী কেউ মারা গেলে তিনি তার সৎকারের জন্যে এগিয়ে

যেতেন। কারুর দুঃখ কষ্টের কথা শুনবামাত্র তিনি বুক দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেন। মন্দিরে স্তব ও প্রার্থনা শুনতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ, সুযোগ পেলে কখনও তা উপেক্ষা করেন নি। অনেক সৎকাজই করতেন বটে, কিন্তু সবই গোপনে, কোন একটা ভাল-কাজ করে ঢাক পিটিয়ে লোকদের জানান পছন্দ করতেন না।

টাকা-পয়সা তাঁর অগাধ ছিল, কিন্তু কখনও তিনি তাই নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করেন নি। তিনি ভাগ্যবান বটে কিন্তু তিনি যে সুখী তা তাঁকে দেখলে কখনও মনে হত না। কেউ কেউ বলত, তিনি অদ্ভুত লোক। তাঁর শোয়ার ঘরখানা ঠিক সাধু সন্ন্যাসীদের মত আড়ম্বরহীন। আসবাবপত্রের মধ্যে দুটি সেকেলে ধরণের রূপার বাতিদান কুলুঙ্গীতে বসান আছে।

•

১৮২১ সালের প্রথম দিয়ে ডি— শহরের সেই মহানুভব বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যুর খবর সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ'ল। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স প্রায় বিরাশী বছর হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অন্ধ হয়ে যান, কিন্তু তাঁর ভগিনী কাছে থাকায় কোন কষ্টই তাঁর হয় নি।

পরদিনই প্রাতে দেখা গেল, মঁসিয়ো মাদ্‌লেন শোক-চিহ্নস্বরূপ কালো পোষাক পরেছেন। ফলে নানা লোকে নানা কথা আলোচনা করতে লাগল। কেউ কেউ স্থির করে বসল যে, বিশপের সঙ্গে মাদ্‌লেনের নিশ্চয় রক্তের সম্পর্ক ছিল। সুতরাং

তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও কিঞ্চিৎ বেড়ে গেল। কোন কৌতূহলী রমণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পরলোকগত বিশপ মিরিয়েল কি আপনার কোন নিকট-আত্মীয় ?'

মাদ্‌লেন জবাবে বলেছিলেন, 'না।'

রমণী এ জবাবে খুশী না হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে তাঁর মৃত্যুতে আপনি যে অশৌচ গ্রহণ করেছেন ?'

মঁসিয়ো তার জবাবে বলেছিলেন যে, তিনি ছেলেবেলায় বিশপের চাকর ছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাভেয়র

১৮২১ সাল। মঁসিয়ো মাদ্‌লেনের সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮১৫ সালে ডি— শহরের বিশপ মিরিয়েলকে লোকে যতটা খাতির করত, এ সময় মাদ্‌লেনেরও ঠিক ততখানিই খ্যাতি-প্রতিপত্তি হ'ল। দশ-বিশ মাইল দূর থেকেও লোক তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসত। ঝগড়াবিবাদ আপোশে মিটিয়ে দেওয়া, আদালতে গিয়ে অনর্থক অর্থ ব্যয় না করা, দুই শত্রুকে মিলিয়ে দেওয়া—এ সব কাজ তিনি অনায়াসেই নিষ্পত্তি করতেন। তাঁকে মধ্যস্থ মানতে কারুরই আর আপত্তি হ'ত না। আইন-কানুন যেন তাঁর ওষ্ঠাগ্রে। তাঁর বিচারে কোন পক্ষই ক্ষুণ্ণ হবার সুযোগ পেত না। শ্রদ্ধাভক্তি জিনিষটাই যেন ছোঁয়াচে, ছয়-সাত বছরের মধ্যেই তা দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

দুনিয়াসুদ্ধ লোক যাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে তাঁকে মেয়র নির্ব্বাচন করায় সকলেই আন্তরিক সুখী হ'ল, কিন্তু সুখী হ'ল না কেবল একজন—সে পুলিশের ইন্সপেক্টর জাভেয়র। সে কিছুতেই কেন যেন মাদ্‌লেনকে বরদাস্ত করতে পারল না।

মাদ্‌লেন যখন এম্-সুর-এম্ শহরে এসে প্রথম কারবার সুরু করেন, জাভেয়র তখনও এ শহরে আসে নি। কিন্তু প্রথম

সাক্ষাতেই যেন জাভেয়রের মনে একটা খট্‌কা বাধল। মাদ্‌লেনের সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা দারুণ সন্দেহের উদয় হ'ল। এ আদল কি ঠিক, না—কাল্পনিক? এঁকে যেন সে চিনতে পেরেছে। ফলে তাঁর উপর জাভেয়রের শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল।

মাদ্‌লেনের চালচলনে যে একটা স্বাভাবিক ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য ছিল, সেটাই জাভেয়রের মনে সন্দেহের কারণ হ'ল। ঠিক এমনই সময়ের একটি ব্যাপারে তার মনের সন্দেহটা সত্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হ'ল। ব্যাপারটি এই,—

একদিন মাদ্‌লেন প্রাতে প্রতিদিনকার মত বেড়াতে বার হয়েছেন। অদূরে একটা ভিড় দেখে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, ফোশল্‌ভাঁ নামে ঘোড়ার গাড়ীর এক বৃদ্ধ গাড়োয়ান নিজের গাড়ীর চাকার তলায় পড়ে গেছে। কাঁচা মাটির পথ, আগের দিন রাতে বৃষ্টি হওয়ায় কাদা হয়ে রয়েছে। গাড়ীখানি মাল বোঝাই। কাজেই চাকা ক্রমেই কাদার মধ্যে বসে যেতে লাগল। ফোশল্‌ভাঁ চীৎকার ক'রে উঠল। লোকজন যে যেখানে ছিল তার চীৎকার শুনে সকলেই ছুটে এল। কিন্তু বুড়াকে বাঁচাবার জন্যে কেউ এগিয়ে গেল না।

মঁসিয়ো মাদ্‌লেন উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কাছাকাছি কারুর জ্যাক্ আছে?'

একজন চাষী উত্তর দিল, 'জ্যাক আনতে লোক পাঠান হয়েছে।'

তিনি পুনরায় শুধালেন, 'কতক্ষণে তা নিয়ে আসবে?'

একজন জবাব দিল 'পনর-বিশ মিনিটের আগে নয়।'

বোঝাই গাড়ীর চাকা কাদায় বসে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আর কিছু সময় থাকলে বৃদ্ধ ফোশল্ভাঁকে অবিলম্বেই মরতে হবে। জ্যাক যখন নিয়ে আসবে, তখন হয় ত আর বুড়াকে জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে না।

এই ফোশলভাঁ মাদ্লেনের অন্যতর প্রবল শত্রু। মাদ্লেন তা জানেন। ফোশল্ভাঁ সামান্য লেখাপড়া জানে, ব্যবসা তার এক প্রকার চলছিল। কিন্তু তারই চোখের সামনে সামান্য শ্রমিক ফাদার মাদ্লেন দেখতে দেখতে শুধু বড়লোক নয়, গোটা ব্যবসাটাই একচেটিয়া ক'রে ফেললেন, আর সে দুবেলা দুমুঠা ভাতেরও জোগাড় করতে পারছিল না। কাজেই মাদ্লেনের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ ছিল এবং প্রাণপণে তাঁর ক্ষতি করবার জন্যে সে চেষ্টা ক'রে এসেছে। অবস্থা যখন এমন দাঁড়াল যে, ব্যবসা আর কিছুতেই চালাতে পারে না, তখন নিরুপায় হয়ে ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে পেটের সংস্থান করত।

মঁসিয়ো মাদ্লেন চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'ভাই সব, পনর-বিশ মিনিট দেরীও সইবে না। তার আগেই আমাদের হতভাগ্য বন্ধু মারা যাবে। এখনও সময় আছে, চেষ্টা করলে ওকে বাঁচান যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কি এমন কেউ শক্তিমান নেই যে, এই গাড়ীর চাকার নীচে কাঁধ দিয়ে গাড়ীখানি একটু উঁচু ক'রে তুলে ধরতে পারে? যে পারবে আমি তাকে দশটি টাকা বকশিস করব।'

সকলেই মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মসিয়ো মাদ্‌লেন পুনরায় বললেন, 'এস, বিশ টাকা দেব।'

কেউ রাজী হ'ল না। ইন্সপেক্টর জাভেয়রও এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলল, 'এদের মধ্যে সকলেই লোকটিকে বাঁচাতে ইচ্ছুক, কিন্তু ওদের মধ্যে এমন কেউ শক্তিশালী নেই, যে গাড়ীখানিকে তুলে ধরতে পারে। অথচ ওখানে জায়গা এত কম যে, এক জনের বেশী ওখানে যেতে পারে না।'

এই সময় সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মঁসিয়ো মাদ্‌লেনের দিকে তাকিয়ে দেখল। এবং পরে বলল, 'আপনি যে প্রস্তাব করেছেন তা করতে পারে এমন লোক সারা ফরাসী মুল্লুকে একটি মাত্র আছে।'

এ কথায় মাদ্‌লেন একটু চমকে উঠলেন। জাভেয়রের নজর মাদ্‌লেনের মুখের পানে। সে বললে, 'সে লোকটি কয়েদী।'

মাদ্‌লেন জবাবে বললেন, 'তাই না-কি!'

'হাঁ, তুলোঁ জেলখানায় কয়েদী ছিল, এখন কোথায়—জানি নে।'

মাদ্‌লেনের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্যে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। এই সময় ফাদার ফোশল্‌ভাঁ যন্ত্রণায় আর একবার ভীষণ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, 'আমি মলাম, আমায় বাঁচাও, তোমরা আমায় বাঁচাও!'

মঁসিয়ো মাদ্‌লেন সেই করুণ আর্ত্তনাদ শুনে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু যে লোকগুলি ভিড় জমিয়ে তামাসা দেখছিল তারা কেউ এগিয়ে এল না। ইন্সপেক্টর জাভেয়রের শ্যেন দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর। মুহূর্ত্তের মধ্যে মঁসিয়ো মাদ্‌লেন

তাঁর গায়ের কোটটি খুলে ফেললেন, তাঁর সবল দেহের পেশিগুলি যেন ফুলে উঠল। একটি কথাও উচ্চারণ না ক'রে তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন। ভিড়ের মধ্যে কেউ একটি কথা বলবার আগেই তিনি গাড়ীর তলায় উপুড় হয়ে পড়ে চাকায় কাঁধ দিতে সুরু ক'রে দিলেন। দুই-দুই বার তাঁর সকল শক্তি খাটিয়েও তিনি গাড়ীখানাকে এতটুকু উপরে তুলতে পারলেন না। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠল, 'ফাদার মাদ্‌লেন, আপনি বেরিয়ে আসুন, তা না হ'লে আপনিও চাপা পড়বেন।'

এবং বুড়া ফোশলভাঁও অনুনয় ক'রে বললে, 'মঁসিয়ো মাদ্‌লেন, আপনি বেরিয়ে যান। আমি ত মরতেই বসেছি। সঙ্গে সঙ্গে আপনিও কেন মরণ ডেকে আনলেন!'

মাদ্‌লেন কোন্ জবাব দিলেন না। লোকগুলি হাঁপিয়ে উঠল। চাকা মাটির মধ্যে অনেকখানি বসে গেছে, এখন আর তাঁর পক্ষে বাইরে বেরিয়ে আসাও অসম্ভব। হঠাৎ গাড়ীখানা নড়ে উঠল, চাকাগুলি কাদার মধ্যে আলগা হ'ল।

মাদ্‌লেন অস্পষ্ট জড়িত স্বরে বললেন, 'ভাই সব, এবার তোমরা সকলে মিলে সাহায্য কর।'

একসঙ্গে তারা প্রায় বিশজন ছুটে গিয়ে গাড়ীখানাকে তুলে ধরল এবং ধরাধরি করে বুড়া ফোশলভাঁকে চাকার নীচে থেকে বার ক'রে নিয়ে এল। মাদ্‌লেন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ ঘর্ম্মাক্ত ও বিবর্ণ, জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, কাদাময়। ফোশলভাঁ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে টলতে টলতে গিয়ে

মসিয়ো মাদ্‌লেনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। মাদ্‌লেনের মুখে চোখে আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠল। ইন্সপেক্টর জাভেয়রের দৃষ্টিও যেন তিনি আর সইতে না পেরে মুহূর্ত্তের জন্যে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

একখানা ডুলি আনিয়ে ফোশল্‌ভাঁকে তাঁর কারখানা-বাড়ীর হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হ'ল। পরদিন ফোশলভাঁ মাদ্‌লেনের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল, তাতে লেখা,—

'ভাই, তোমার ঘোড়াটি মরে গেছে, আর গাড়ীখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তাই তার মূল্য বাবদ তোমায় কিছু টাকা পাঠালাম। গ্রহণ ক'র। ইতি—

মাদ্‌লেন

দিন কয়েকের মধ্যেই ফোশল্‌ভাঁ সেরে উঠল, কিন্তু একখানি পা কিছুতেই আর স্বাভাবিক হ'ল না।

ফাদার মাদ্‌লেনই প্যারিসের স্যাঁৎ আঁতোয়ান পল্লীর একটি আশ্রমে তাকে মালীর কাজ জোগাড় করে দিলেন।

এই ঘটনার পর থেকেই মাদ্‌লেন সম্বন্ধে জাভেয়রের মনের সংশয় আরও দৃঢ় হ'ল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তখন মেয়রের বিরুদ্ধাচরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব, তাই নত মস্তকেই সে মেয়রের আদেশ পালন করতে লাগল। এবং সমস্ত প্রমাণপঞ্জির জন্যে ভিতরে ভিতরে সন্ধান চালাতে লাগল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার জেলখানায়

শেষ পর্য্যন্ত জাভেয়র তার মতলব হাসিল করল। সম্মানিত মেয়রের পরিচয় সংগ্রহ ক'রে সে প্রমাণ ক'রে দিল যে, এ ব্যক্তি একজন দাগী কয়েদী এবং নামকরা দস্যু।

১৮২৩ সালের ২৫ জুলাই তারিখের খবরের কাগজে নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত হল।—

> এম্-স্যুর-এম্ শহরে সম্প্রতি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে গেছে। বছর কয়েক যাবৎ মঁসিয়ো মাদ্লেন নামে এক ব্যক্তি ওই শহরে এসে নকল চুনীর কারবার সুরু করে এবং নতুনতর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেখতে দেখতে কারবারে প্রচুর অর্থ রোজগার করে এবং শহরের ও জেলার সর্ব্বত্র জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যথেষ্ট অর্থব্যয় করে। তার এই সব সদনুষ্ঠানের জন্যে স্বয়ং সম্রাট খুশী হয়ে তাকে মেয়রের পদে নির্ব্বাচিত করেন। পুলিশ সম্প্রতি সন্ধান নিয়ে মঁসিয়ো মাদ্লেনের পূর্ব্ব পরিচয় সংগ্রহ করেছে। তাতে জানা গিয়েছে যে, এ ব্যক্তির আসল নাম জাঁ ভাল্জাঁ এবং সে ১৭৯৬ সালে চুরীর দায়ে দীর্ঘকালের জন্যে শাস্তি

ভোগ করে। চুরীর অভিযোগে জেলে যাওয়ার আগে সে ভোগা দিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে বহু টাকা আত্মসাৎ করে। এই টাকাটা যে সে কি করল তা জানবার জন্যে বহু চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কার্য্যকরী হয় নি।'

ওই তারিখেরই আর একখানা কাগজে এই খবরটিই আরও বিস্তৃত হয়ে প্রকাশিত হয়।—

'জাঁ ভালজাঁ নামে এক দাগী আসামী সম্প্রতি এক অদ্ভুদ উপায়ে গ্রেফ্‌তার হয়ে বিচারার্থ প্রেরিত হয়েছে। এই লোকটা এতকাল পুলিশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে এম্‌-সুর এম্‌ শহরের সম্মানিত মেয়রের পদে নির্ব্বাচিত হয়। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের অপূর্ব্ব কৃতিত্বে লোকটি ধরা পড়েছে। এই লোকটার দেহে অসুরের মত বল। গ্রেফ্‌তারের পর পুলিশের হাত থেকে কেমন করে পলায়ন করে প্যারিসে যায়। এবং সেখান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার মুখে গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় তাকে ফের্‌ গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যে তিন-চার দিন বাইরে ছিল তার মধ্যেই ব্যাঙ্ক থেকে তার জমান প্রায় দশ-বার লাখ টাকা কৌশলে তুলে নিয়েছে। পুলিশের বিশ্বাস, টাকাটা সে কোথাও গোপনে লুকিয়ে

রেখে দিয়েছে, সুতরাং গ্রেফতারের সময় তার কাছে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই হয়েছে যে, বছর আট আগে জেল থেকে বেরিয়েই সে একটি দশ-বার বছর বয়সের ছেলের যথাসর্ব্বস্ব জোর করে নিয়ে তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

'লোকটা আদালতে নিজের পক্ষ সমর্থন করে নি বটে, কিন্তু পুলিশ প্রমাণ করেছে যে, এই লোকটা এক প্রকাণ্ড ডাকাতের সর্দ্দার। বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হয়েছে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সে আপীলও করে নি, তবে সম্রাট তাঁর প্রতি করুণা দেখিয়ে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন। জাঁ ভাল্‌জাঁকে তুলোঁর জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

মঁসিয়ো মাদ্‌লেনের সঙ্গে সঙ্গেই এম্‌— শহরের শ্রী দেখতে দেখতে উবে গেল। তিনিই যেন ছিলেন এই শহরের প্রাণ। তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। কারিগরেরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা কারবার ফেঁদে বসল। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষ দেখা দিল। ছোটখাট কারবার অনেক গজিয়ে উঠল বটে

কিন্তু তারা দেশের দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজেদের পকেটের দিকে একান্তভাবে নজর দিল। কাজেই সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা এসে আসন গেড়ে বসল। মঁসিয়ো মাদ্‌লেন ভাল জিনিষই বাজারে চালাতেন কিন্তু এখন জিনিষ হতে লাগল অত্যন্ত খারাপ। ফলে এক সময় এটা যত সমাদর লাভ করেছিল, এখন আবার তেমনি অনাদর লাভ করল। লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ব্যবসা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

জলডুবী

১৮২৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষাশেষী তুলোঁর বন্দরে একখানা জীর্ণ যুদ্ধ জাহাজ এসে ভিড়ল। সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে জাহাজখানা জবর মার খেয়ে কোন প্রকারে মেরামতের জন্যে এসে নোঙর বেঁধেছে।

নতুন কোন জাহাজ এলেই শহরের কতকগুলি অলস কর্ম্মহীন লোকের কাজ জুটে যায়, বিশেষত ঝড়ের মুখে পড়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে যে যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌঁছুল তার সম্বন্ধে ওই সব লোকের কৌতূহল আরও অনেক বেশী। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত পোস্তায় তাদের ভিড় দেখে কে! কত রকম খবরই না তারা প্রচার করতে লাগল।

সেদিন প্রাতে একটা কাণ্ড ঘটল। খালাসীরা পাল তুলতে ব্যস্ত ছিল। মাস্তুলের শেষ প্রান্তে উঠে দড়ি বাঁধতে গিয়ে পা হড়কে একটি খালাসী নীচে পড়ে গেল। নীচে পড়ে গেল, কথাটা হয় ত ঠিক হ'ল না,—বরং নীচে পড়তে পড়তে মাঝ পথে একটা দড়ি ধরবার সুযোগ পেয়ে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলছিল বলাই ঠিক। মাস্তুলের মাচানের সঙ্গে দড়িটি পালের একটা তেড়চা খুঁটির সঙ্গে বাধা ছিল। ওখান থেকে পড়লে গভীর অতলস্পর্শী সাগরে তলিয়ে যেতে হবে। সকলেই হায় হায় করে উঠল,

কিন্তু কেউ হতভাগ্য খালাসীকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না। আর আসাও ত চারটিখানি কথা নয়, নিজের জীবন বিপন্ন করতে কে চায়!

বেচারা খালাসীটার অবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। ভয়ে আতঙ্কে সে আধমরা হয়ে গেছল। তার উপর দড়িটা এমন দুলছিল যে, সে নড়া চড়া করতেও সাহস পাচ্ছিল না, পাছে সেটা ছিঁড়ে যায়!

কিন্তু ও অবস্থায় কতক্ষণই বা থাকা যায়। হাত-পা সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল, মুখে ভীতির চিহ্ন, কিছু বলতে পারছিল না। আতঙ্কে ভয়ে ডাঙার লোকগুলি তার দিকে তাকাতে পারছিল না। একটা জ্যান্ত লোক তাদের চোখের সুমুখে ওরকম অপঘাত মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হচ্ছে, তাকে বাঁচাতে পারছে না বটে কিন্তু তার মরণটাও ত চোখে দেখা যায় না।

এমন সময় দেখা গেল, কাঠ-বেড়ালির মত ক্ষিপ্রগতিতে একটা লোক মাচানের উপর উঠে যাচ্ছে। লোকটির গায়ে লাল পোষাক, সুতরাং সে যে কয়েদী তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাথায় তার নীল টুপি, অতএব সে যে সারা জীবনের জন্যেই কয়েদী তা বোঝা গেল। লোকটা মাচানের উপর গিয়ে উঠল। হঠাৎ বাতাসে তার মাথার টুপি উড়ে গেল এবং তখন দেখা গেল তার মাথার চুল শাদা ধব্‌ধবে, কাজেই সে যে যুবক নয় তাতে আর কারুর সন্দেহ রইল না।

এই কয়েদীটি পাশের জাহাজে আসছিল। ব্যাপারটা দেখে সে ছুটে কাপ্তানের কাছে গিয়ে বললে, 'আমায় যদি হুকুম দেন ত আমি লোকটাকে বাঁচাতে পারি।'

কাপ্তান তখন কি একটা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কয়েদী এক লাফে কামরার বাইরে এসে একটা হাতুড়ি দিয়ে জোরে এক ঘা মারতেই পায়ের শিকল খান্‌ খান্‌ হয়ে ভেঙে গেল। একটা শক্ত লম্বা দড়ি নিয়ে সে তড়িৎবেগে গিয়ে মাচানের উপর উঠল। কত সহজে যে সে পায়ের বেড়ী ভাঙল তা কেউ দেখল না।

উপরে উঠে একবার ভাল করে চারদিক চেয়ে দেখে নিল। মুহূর্ত্ত সময় যেন এক যুগ বলে মনে হচ্ছিল। কয়েদী একবার উপরের দিকে তাকাল। তারপর মাচানের এক প্রান্তে দড়ি গাছটির একপ্রান্ত বেশ শক্ত করে বেঁধে দড়িটি নীচে ঝুলিয়ে দিল। এবং চক্ষের পলকে সেই দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

ডাঙার লোকগুলির যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এতক্ষণ ছিল একজন, এখন দেখা গেল দুজন। মাকড়শা যেমন ক'রে পতঙ্গকে ধরে তেমনই ক'রে সে নীচে নেমে এল। তবে মাকড়শা ধায় পতঙ্গকে উদরস্থ করবার জন্যে, আর এক্ষেত্রে পতঙ্গকে রক্ষা করবার জন্যে।

খালাসীটা আর ঝুলতে পারছিল না। মুহূর্ত্ত বাদেই হয় ত তাকে হাত ছেড়ে দিয়ে অতলে তলিয়ে যেতে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কয়েদী ঝুলতে ঝুলতে নীচে নেমে এক হাতে দড়ি ধ'রে আর এক হাতে খালাসীটিকে বগলদাবা ক'রে নিল। খালাসীটিও তাকে আঁকড়ে ধরল, তখন কয়েদী অনায়াসে আবার দড়ি বেয়ে মাচানের উপর গিয়ে উঠল। খানিকক্ষণ দুজনে সেখানে বিশ্রাম ক'রে পরে নীচে তার সহকর্ম্মীদের কাছে তাকে পৌঁছে দিল।

উৎসুক জনতা চীৎকার করে আনন্দোল্লাস জানাল এবং তারা চেঁচিয়ে বলাবলি করতে লাগল, 'এই কয়েদীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত!'

কয়েদী নীচে নেমে নিজের কাজে ফিরে যেতে প্রস্তুত হ'ল। এবং হঠাৎ একটা দড়ি বেয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দর্শকের দল 'গেল গেল' ক'রে চেঁচিয়ে উঠল।

সে যেখানে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল সেটা দুখানা নোঙর-করা জাহাজের মধ্যেকার জায়গা, সুতরাং সে যে আর উঠতে পারবে না সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেল।

একখানা জাহাজী ডিঙি নিয়ে চারজন লোক তখনই নেমে গেল, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। লোকটি একবারও জলের উপর ভেসে উঠল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

পরদিন তুলোঁর একখানা খবরের কাগজে এই খবরটি বার হ'ল,—

কাল একজন কয়েদী জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে যায়। সে একজন খালাসীকে আশ্চর্য্য রকমে রক্ষা করে, পরে নিজে টাল সামলাতে না পেরে সলিল সমাধি লাভ করেছে। তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তার নাম জাঁ ভাল্‌জাঁ। আমরা তার আত্মীয়স্বজনের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

দশম অধ্যায়

ভিক্ষুকের ভিক্ষাদান

খবরের কাগজে জঁা ভাল্জঁার অপমৃত্যুর খবর প্রকাশিত হ'লেও আসলে সে যাত্রা তাঁর জীবন রক্ষা হয়েছিল।

১৮২৩ সালের শেষাশেষী তাঁকে প্যারিসের জনবিরল শহরতলীর একটি বাড়ীতে বাস করতে দেখা গেল। সঙ্গে তাঁর আট বছর বয়সের এক অনাথা বালিকা, নাম কোজেৎ। বালিকাটি এক হতভাগিনীর কন্যা, এক সময় সে মঁসিয়ো মাদ্লেনের স্নেহের পাত্রী ছিল এবং মৃত্যুর সময় নিরাশ্রয় কন্যাকে উপকারকের হাতেই সঁপে দিয়ে যায়।

জঁা ভাল্জঁা তাঁর আশ্রয় স্থানটি বেশ নির্ব্বাচন করে নিয়েছেন। এখানে এতটুকু ভয়ের আশঙ্কা নেই। তাঁদের শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখা যায়, সামনেই একটি ছোট্ট পার্ক, লোকজন সেখানে বেড়ায়, হাসে, গল্প করে। আর ঘরটি সারা বাড়ীর মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। সুতরাং প্রতিবেশীদের মনে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলের কোন হেতুই ছিল না। নীচের তলার ঘরগুলি সরু সরু, চালাঘরের মত, স্যাঁৎসেঁতে, এতে অত্যন্ত দরিদ্র শ্রমিকরাই বাস করে এবং দোতলার সঙ্গে একতলার কোন সম্বন্ধ নেই। দোতলায় খানকয়েক ভাল ঘর আছে, আর সবগুলিই ঘর নয়, ছোট ছোট কুঠরি। ভাল্জঁার

পরিচারিকা এই সব কুঠরির একটিতে বাস করে। এ বাড়ীর ভাড়াটেদের মধ্যে এই বুড়ীর প্রতিপত্তি অনেক, সে আসলে বাড়ীর দরোয়ান, সুতরাং বিনাভাড়ায় বাস করবার অধিকার পাওয়ায় বাড়ীওয়ালার পক্ষ টেনে চলা তার পক্ষে স্বাভাবিক।

কোম্পানীর কাগজের সুদ থেকেই গরীবানা ভাবে তাঁদের চলে —এই পরিচয়ই জাঁ ভাল্‌জাঁ ঘরভাড়া নেওয়ার সময় দিয়েছিলেন, ছ'মাসের ভাড়ার টাকা তিনি আগাম জমা দিয়েছেন এবং ঘরের খবরদারী করবার ভার দরোয়ান বুড়ীর উপর ন্যস্ত ক'রে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেছে, ভাল্‌জাঁ ও কোজেৎ বড় সুখেই দিন কাটান। ভোর না হতেই কন্যার ঘুম ভাঙে, আর সে কত রকম গল্প, হাসি, গান দিয়ে বৃদ্ধ ভাল্‌জাঁকে সজীব ক'রে তোলে।

ভাল্‌জাঁ কোজেৎকে লেখাপড়া শেখাতে সুরু করে দিলেন, কেন-না মেয়ের বয়স হতে চলল, মূর্খ ক'রে রাখলে চলবে কেন। যিনি আজন্ম কয়েদী, তাঁর মনেও সময় সময় ভাল ভাব, ভাল আদর্শ উঁকি মারে, কিন্তু ভাগ্য যাঁকে নিয়ে নির্ম্মম ভাবে ছিনিমিনি খেলছে, তাঁর চিত্তে সাধুসঙ্কল্প স্থায়ী হওয়ার সুযোগ পায় না। তিনি প্রাণপণে তাঁর গতজীবনের ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কোজেৎকে লেখাপড়া শেখান, আর তার খেলাধূলার সাথী হওয়া—এ দুটি কাজই এখন ভাল্‌জাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে দেখা দিল। কোজেৎ তাঁকে বাবা বলেই জানে এবং তাঁর

অন্য কোন পরিচয় আছে বা থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। কোজেৎ আপন মনে বিড়্ বিড়্ করতে করতে পুতুলকে জামাকাপড় পরায়, বৃদ্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ বিস্ময়ে তা দেখেন। আপন মনেই সে পুতুলের সঙ্গে কথা বলে, জবাব দেয়, তিনি মন দিয়ে তা শোনেন। জীবনের যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে এখন তিনি তা বুঝতে পেরেছেন। মানুষের মধ্যে যে সাধু ও ভাললোক আছে, এখন আর একথা তাঁর কাছে মিথ্যা নয়। এখন আর তিনি মনে মনেও কাউকে দোষ দেন না। এখন তাঁর বেঁচে থাকার আগ্রহ জন্মেছে। আজ তিনি বেঁচে থাকতেই চান, কেন-না, আজ এই শেষজীবনে মনুষ্যত্বের সন্ধান তিনি পেয়েছেন,—কোজেৎ তাঁকে সাড়া অন্তর দিয়ে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

তিনি দিনের বেলা ঘরের বার হন না, পাছে তাঁকে কেউ চিনে ফেলে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনি দু-এক ঘণ্টার জন্যে একাকী বেড়াতে বার হন, কোন কোন দিন কোজেৎও তাঁর সঙ্গে যায়। এবং যে-রাস্তায় লোক চলাচল কম, সেই সব রাস্তায়ই তাঁরা বেড়াতে যান। রাত্রির বেলায় গীর্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করেন। যে-দিন একা বার হন, সেদিন কোজেৎ বুড়ীর হেপাজতে ঘরে থাকে, কিন্তু বাবার সঙ্গে বেড়াতে পেলে বালিকা ভারী খুশী হয়। রাস্তায় বের হলেই কোজেৎ-এর প্রাণে ফুর্ত্তি আসে, সে নানা রকম প্রশ্ন ক'রে ক'রে বুড়াকে এক-মুহূর্ত্তের জন্যেও আর কিছু ভাবতে দেয় না।

বুড়ী তাদের ঘরদরজা পরিষ্কার রাখে, রান্না করে, জিনিষ-পত্র কেনাকাটি করে। তাঁদের চালচলনে খাওয়াপরায় এত আড়ম্বর নেই। লোকে তাঁদের গরীব ব'লেই মনে করে। প্রথম দিন তাঁদের ঘরে যে আসবাব-পত্র ছিল আজও তাই আছে, এতটুকু অদল-বদল আবশ্যক হয় নি। রাস্তায় যখন ভাল্‌জাঁ বার হন তখন তাঁর চাল-চলন ও সাজ-পোষাক দেখলে লোকে গরীব মজুর বলেই মনে করে।

এক একসময় তিনি যখন রাস্তায় বার হন তখন পথে কোন দয়ালু মহিলা তাঁকে ভিখারী মনে ক'রে এক-আধ পয়সা দান করলে তিনি নতমস্তকে সেই দান গ্রহণ করেছেন। আবার এমনও হয়েছে যে, পথ চলতে চলতে তাঁর কাছেও কোন ভিখারী ভিক্ষা চেয়েছে। তিনি তখন চারিদিক একবার ভাল ক'রে দেখে চট্‌ ক'রে ভিখারীর সামনে গিয়ে দুটা-একটা পয়সা, কাউকে বা এক আনা, দু আনা, চার আনা পর্য্যন্ত দিয়ে আবার তখুনি পিছন না ফিরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে গেছেন।

এতে একটু অসুবিধা হ'ল, কেন-না, আস্তে আস্তে লোকজন সব অনেকেই জেনে ফেলল যে, তিনি নিজে গরীব বটে, কিন্তু তিনিও আবার সময় সময় ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়ে থাকেন।

বুড়ী ঝিটা কাউকে সুনজরে দেখত না, সকলের উপরই তার একটা ঈর্ষা ও সন্দেহের ভাব সব সময়ই ছিল, অথচ তিনি কিন্তু তা জানতে পারেন নি। বুড়ী কানে কম শোনে, দিনরাত বিড়বিড় করা তার স্বভাব। দাঁত তার সব কয়টিই পড়ে গেছে,

কেবল সামনেকার উপর-নীচের দুটি তখনও মায়া ছাড়তে পারে নি, তবে নড়বড় করে, কখন যে পড়ে যায় কেউ বলতে পারে না। দিনরাত সে ওই দুটি নড়বড়ে দাঁতেই কিড়মিড় করে।

একদিন ভাল্‌জাঁ পাশের একটা খালি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাই দেখে বুড়ী একটু কৌতূহলী হ'ল, কেন-না, ভাল্‌জাঁ যে কখনও অমন সময় ওরকম স্যাঁৎসেঁতে ঘরে কেন গেলেন এটা বুড়ী ধারণায়ও আনতে পারল না। সে গোপনে তাঁর অনুসরণ ক'রে এমন একটা জায়গায় গিয়ে উঁকি মেরে দাঁড়াল যেখান থেকে সে ঘরের মধ্যে ভাল্‌জাঁ কি করেন না-করেন সবই দেখতে পাবে, অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না। ভাল্‌জাঁ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, কিন্তু তিনি কি করছেন তা ফাটল দিয়ে যে কেউ দেখতে পারে—এ খেয়াল তাঁর হয় নি। ভাল্‌জাঁ তাঁর কোটের আস্তরের একটা বিশেষ জায়গার সেলাই কাচির সাহায্যে খুলে ফেললেন এবং ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একতাড়া কাগজ বার করলেন এবং একখানি রেখে বাকী কাগজের তাড়াটি পুনরায় যত্ন ক'রে যথাস্থানে রেখে ছুঁচ সুতা দিয়ে পুনরায় সেলাই ক'রে রাখলেন। বুড়ী স্পষ্ট দেখতে পেল, কাগজখানা আর কিছুই নয়,—একশ টাকার একখানি নোট! বুড়ীর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। সে আর তখন সেখানে দাঁড়াতে পারল না, ছুটে পালিয়ে গেল।

একটু পরেই জাঁ ভাল্‌জাঁ সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বুড়ীকে

ডেকে একশ টাকার নোটখানা ভাঙিয়ে আনতে অনুরোধ করলেন এবং এ কথাটিও জানিয়ে দিলেন যে, কাল কোম্পানীর কাগজের ছ'মাসের সুদের টাকা পেয়েছে।

বুড়ী মনে মনে বলল, কাল সারাদিন ত উনি ঘরের বার হন নি, ছ'টার পর বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তখন ত ব্যাঙ্ক খোলা থাকে না, তাহলে কেমন ক'রে টাকা পেলেন ?

বুড়ী নোটখানা ভাঙাতে বার হয়ে গেল।

এরই দিন কয়েক পরে, ভাল্‌জাঁ একদিন কি একটা কাজে ঘরের বাইরে ব্যস্ত ছিল, কোজেৎও বাপের সঙ্গেই ছিল, বুড়ী ঝি তখন ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত ছিল। একটা পেরেকে বুড়ার কোটটি ঝুলান রয়েছে। বুড়ীর মনে কৌতূহল হ'ল, সে কোটটাকে একবার নেড়েচেড়ে পরখ ক'রে দেখল। তাতে নেই হেন জিনিষ কিছুই নেই,—ছুঁচ, সুতা, কাচি, এক বাণ্ডিল কাগজপত্র, বড় ছুরি একখানা এবং বিভিন্ন রকমের ও রঙের পরচুলও অনেকগুলি। তাছাড়া কোটের কাপড় ও আস্তরের কাপড়ের মাঝে মুখ সেলাই করা একটি পকেট, তার মধ্যে এক তাড়া কাগজ, এও কি ব্যাঙ্ক নোট !

এমনই করে তাদের ছয় মাস প্রায় শেষ হয়ে এল।

একাদশ অধ্যায়

শিকারী ও শিকার

ভাল্‌জাঁ যে পাড়ায় বাসা নিয়েছিলেন তারই কাছাকাছি একটা রাস্তার ধারে রোজই একটা ভিক্ষুক সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষা করত। ভাল্‌জাঁ প্রায়ই তাকে দুটা-একটা পয়সা দিতেন। এই ভিখিরীকে কিছু-না-কিছু না দিয়ে তিনি কখনও সে পথ দিয়ে চলতেন না। সময় সময় তার সুমুখে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে এক-আধটুকু আলাপও করতেন। ভিখিরীটা যাদের চক্ষুশূল তারা তার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলাবলি করত। কেউ বলত, ও পুলিশের গুপ্তচর, ভিক্ষা করাটা ভাণ মাত্র। একসময় সে গ্রাম্য চৌকিদারের কাজ করত, এখন সারাক্ষণই বসে বসে মালা জপ করে। বয়স প্রায় পঁচাত্তর হবে।

একদিন সন্ধ্যার পর ভাল্‌জাঁ একা-একা পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভিখারী তার নিয়মিত জায়গায় বসে আছে, এই মাত্র একটি আলো জ্বেলে ভাল্‌জাঁকে দেখতে পেয়েই অভ্যাস মত ভিক্ষা চাইল। ভাল্‌জাঁ তাকে দু-একটা পয়সা দিতে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় ভিখারী একবার মুখ তুলে তাঁর পানে তাকাল। প্রদীপের মিটমিটে আলোকে ভিখিরীর মুখখানা দেখে ভাল্‌জাঁ চমকে উঠলেন। এ মুখ যেন তাঁর চেনা-চেনা, এ ত মালা জপকারী ভিখিরীর মুখ নয়। তাঁর তখন অবস্থা ভারী সঙীন, অন্ধকারে পথ চলতে চলতে মানুষ

একটা বাঘ সুমুখে দেখতে পেলে যেমন আঁতকে ওঠে, ভাল্‌জাঁরও সেই রকম হ'ল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি না-পারলেন পিছিয়ে যেতে, না-পারলেন নিঃশ্বাস ফেলতে,—হাঁ ক'রে ভিখিরীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ভিখিরী তখন মাথা নীচু ক'রে রয়েছে, সে যেন সেখানে নেই এমনই মনে হ'ল।

ঠিক এই সময় ভাল্‌জাঁর মনে হ'ল, বাঁচতে হ'লে একটি কথাও বলা উচিত হবে না। ভিখিরীর সেই একই অবস্থা, একই সাজ, রোজ যেমন তাঁর দিকে তাকায় আজও তেমনই। ভাল্‌জাঁ আপন মনেই ব'লে উঠলেন, 'দূর ছাই, আমি পাগল হলাম নাকি, এ অসম্ভব!'

তিনি আর সে দিন বেড়াতে গেলেন না, ঘরে ফিরে এলেন। মন থেকে কিন্তু ভাবনাটা গেল না। মন বলছে, যে মুখ তাঁর চেনা-চেনা মনে হ'ল সে কি তাঁর পরম শত্রু ইন্সপেক্টর জাভেয়রের নয়!

তিনি আর ভাবতেও চাইলেন না।

ভিখারীকে কিছু বললেনও না, ভিক্ষাও দিলেন না, চলে এলেন। এ জন্যে তাঁর দুঃখ হ'ল। কেন-না, বেচারী দু-দুবার মাথা তুলে তাঁর দিকে ভিখিরীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

পরদিন সন্ধ্যা বেলায়ও ভিখিরীটা ঠিক তেমনি ব'সে ছিল। ভাল্‌জাঁ তার সুমুখে গিয়ে বললেন, 'খবর কি হে? কেমন আছ?' ব'লেই তিনি তাকে একটি একআনি দিলেন।

ভিখিরী হাত পেতে আনিটি নিয়ে ভাল্‌জাঁর মুখের পানে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

না, তারই ভুল। এ নিশ্চয়ই সেই চৌকীদার-ভিখিরীটাই। ভাল্জাঁর মনে আর কোন সন্দেহই রইল না। আপন মনে হেসে তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন, 'একে আমি জাভেয়র মনে করেছি! পাগলামি আর কাকে বলে। হয় আমার চোখের জোর কমে গেছে, নয় ত মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

ব্যাপারটা তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

তারপর দিনকয়েক কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যা আটটার সময় তিনি কোজেৎকে বানান শেখাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সদর দরজা খোলার শব্দ পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা বন্ধ হয়েও গেল।

ব্যাপারটা তাঁর কাছে কেন যেন ভাল লাগল না। বিশেষত, বুড়ী আর তিনি ছাড়া বাড়ীতে তখন আর কেউ ভাড়াটে ছিল না, আর বুড়ী খরচ কমানর অজুহাতে সন্ধ্যা হতে না হতেই শুয়ে পড়ে। ভাল্জাঁ কোজেৎকে চুপ করবার জন্যে ইসারা করলেন, কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে, জুতার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হ'তে পারে বুড়ীই আসছে, হয় ত কোন দরকারী কাজে বাইরে বেরিয়েছিল। ভাল্জাঁ কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগলেন। পায়ের শব্দ খুব ভারী ব'লেই মনে হ'ল, নিশ্চয়ই পুরুষের চলার শব্দ, বুড়ীরও হতে পারে—ও তলা-উঁচু ভারী জুতাই পরে কি-না।

সে যাই হোক না, সাবধানের মার নেই, ভাল্জাঁ ফুঁ দিয়ে

চট্‌ ক'রে বাতীটি নিবিয়ে দিলেন। কোজেৎকে চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে বললেন। তাঁদের দরজার কাছে এসেই পায়ের শব্দটা যেন থেমে গেল, ভাল্‌জঁা নীরবে দম বন্ধ ক'রে দরজার দিকে পিছন ফিরে কান খাড়া ক'রে ব'সে রইলেন।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিছুই বোঝা গেল না। শব্দটাও আর শোনা গেল না। পিছন ফিরে দরজার পানে তাকালেন। ছিদ্র-পথে বাইরে যেন একটা ছোট্ট আলো দেখা গেল—ঘোর অন্ধকারে সেই আলোটিকে একটা দুষ্টগ্রহের মতই তাঁর মনে হ'ল। কেউ যে দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মিনিট কয়েক এমনই চুপচাপে কেটে গেল। ইতিমধ্যে বাইরের আলোটাও যেন আর দেখা গেল না, অথচ পায়ের শব্দও শোনা গেল না, কাজেই মনে করতে হবে যে, লোকটা হয় ত পায়ের জুতা খুলে ফেলেছে।

ভাল্‌জঁা জামাকাপড় পরেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন, কিন্তু সারা রাত্তিরে একটি বারও ঘুমাতে পারলেন না।

পরদিন সকাল বেলা পাশের ঘরের দরজাখোলার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল এবং গত রাত্রিরের সেই পায়ের শব্দ—শুনতে পেলেন। চুপি চুপি কবাটের ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, কিন্তু দালানে তখনও বেশ অন্ধকার থাকায় লোকটাকে স্পষ্ট দেখা গেল না। এবারে লোকটা ভাল্‌জাঁর ঘরের সামনে না থেমে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির কাছাকাছি

যেতেই আলোতে তার মুখ ভাল ক'রেই দেখা গেল। লোকটা আকারে লম্বা, গায়ে একটা লম্বা কোট, হাতে মোটা একটা লাঠি —দেখতে অনেকটা জাভেয়রেরই মত। জানলা দিয়ে আর একবার ভাল ক'রে দেখে নেবার মতলবে তিনি জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে দেখবেন ভাবলেন, কিন্তু জানলাটা খুলতে সাহস পেলেন না।

সকাল সাতটায় বুড়ী প্রতি দিনকার মত ভাল্‌জাঁর ঘরদরজা পরিষ্কার করতে এল। ভাল্‌জাঁ তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করলেন না। বুড়ী বেশ ভাল মানুষের মত প্রতিদিনকার কাজ করতে লাগল। ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বুড়ী ভাল্‌জাঁর দিকে চেয়ে বলল, 'কাল রাত্তিরে কারুর আসার শব্দ পেয়েছেন, কেমন, তাই না!'

ভাল্‌জাঁ স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'হাঁ, পেয়েছি। কে বল দেখি?'

'কাল একজন নতুন ভাড়াটে এল কি-না, তাই।'

'কি নাম?'

'নামটা ঠিক মনে হচ্ছে না, দ্যুমঁ, না, দোমঁ—কি যেন বলেছিল।'

'কি করে?'

বুড়ী একবার ভাল্‌জাঁর দিকে তার খুদে চোখ দুটো দিয়ে মিট মিট ক'রে তাকাল, পরে জবাব দিল, 'আপনার মতই জমান টাকায় চলে।'

হয় ত বুড়ীর কথাটার মধ্যে কোন কিছুর ইঙ্গিত ছিল না,

কিন্তু ভাল্‌জাঁর মনে চট্‌ ক'রে এর একটা মানে বেরিয়ে পড়ল। বুড়ী কাজ সেরে চলে যেতেই তিনি দেরাজ খুলে টাকাকড়ি যা-কিছু ছিল সবই একটা গেঁজিয়ার মধ্যে ভরে ফেললেন এবং যাতে শব্দ না হয় সে দিকে তাঁর যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সশব্দে একটা টাকা মেজেতে পড়ে গেল।

সন্ধ্যা হতেই তিনি একবার নীচে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তাঁর মনে হ'ল, এ পথে আসা-যাওয়া করতে লোকেরা যেন আজ ভুলেই গেছে। হতে পারে কেউ গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গিয়ে তিনি কোজেৎকে বললেন, 'চলে আয় ত মা।'

কোজেৎকে হাতে ধরে তিনি ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

•

ভাল্‌জাঁ রাস্তায় বেরিয়ে বার দুই রাস্তাটা টহল মেরে বেড়ালেন এবং পরে এগিয়ে চললেন। কেউ পিছু নিয়েছে কি-না বুঝবার জন্যে এ-গলি সে-গলি দিয়ে যেতে লাগলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে, বেশ জ্যোৎস্না। রাস্তার এখানে সেখানে জ্যোৎস্নার ছায়ায় আঁধার। ভাল্‌জাঁর পক্ষে ভালই হ'ল। আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চলার সুযোগ পেলেন। এবং তা ছাড়া, জ্যোৎস্নার সাহায্যে তিনি অপরকে দেখতে পাবেন, অথচ অপরে তাঁকে দেখতে পাবে না।

কোজেৎ বাবার হাত ধরে নীরবে চলছিল, একটি কথাও বলে

নি। অতটুকু মেয়েও যেন নিজেদের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে।

রাত তখন এগারটা বেজেছে। তাঁরা কোতোয়ালীর সামনে দিয়ে গেল। খানিটা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই ভাল্‌জাঁ আপিসের আলোতে দেখতে পেলেন—তিন ব্যক্তি তাঁদের দিকেই আসছে। তাঁর মনে হ'ল, তারা হয় ত তাঁদেরই অনুসরণ করছে। ভাল্‌জাঁ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চললেন। সেই তিন ব্যক্তির একজন খানিকটা এসে ফের্ কোতোয়ালীতে ফিরে চলে গেল এবং আর একজন—যে আগে আগে আসছিল—তাকে দেখে তাঁর মনে দস্যুর মত সন্দেহ হ'ল।

ধাঁ ক'রে তিনি পাশের একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলিতে ঢুকে পড়লেন। সে গলি থেকে পর পর সাত-আটটা গলি ঘুরে তাঁরা এগিয়ে চললেন। এবারে গিয়ে তাঁরা একটা খোলা পার্কের মত জায়গায় প'ড়লেন।

চারিদিক জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকিত। ভাল্‌জাঁ লোকটাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা বাড়ীর দেউড়ীতে ঢুকে পড়লেন। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই অনুসরণকারীরা এসে উপস্থিত হ'ল। তাদের দলে এখন চারজন, সকলের চেহারাই বেশ লম্বা, গাট্টাগোট্টা ধরণের; গায়ে লম্বা কোট, মাথায় গোল টুপি এবং হাতে মোটা মোটা লাঠি। তাদের সে চেহারা দেখলে সবারই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। তা ছাড়া এই দুপুর রাত্রে তারা যে মতলবে বেরিয়েছে তা যে মোটেই সাধু নয় তা বলাই বাহুল্য। তারা যে ভদ্রবেশী চারজন নিষ্ঠুর

দানববিশেষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খানিক বাদেই তারা এসে পৌঁছুল এবং পার্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত, শিকার কোন্ দিকে গেল ইত্যাদি বিষয়েই পরামর্শ করতে লাগল। দলপতি আঙুল দিয়ে ভাল্‌জাঁ যে দিকে গেছে সেই দিক দেখিয়ে দিল, কিন্তু আর একজন দিল ঠিক তার বিপরীত দিক দেখিয়ে। আলোচনার পর সম্ভবত দুই দল দুই দিকে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল, কেন না, দলপতি তার নির্দ্দেশমত এগিয়ে চলল, অন্য দল তার বিপরীত দিকে চলে গেল।

জ্যোৎস্না তখন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাল্‌জাঁ সেই জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেল, দলপতি আর কেউ নয়—স্বয়ং ইন্সপেক্টর জাভেয়র—তাঁর পরম শত্রু! অতঃপর তার মতলব বুঝতে ভাল্‌জাঁর আর বাকী রইল না।

অনুসরণকারীদের আলোচনা করতে বেশ খানিকটা সময় গেল, এই সময়ের মধ্যে ভাল্‌জাঁ ভেবেচিন্তে তাঁর কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নিলেন। দেউড়ীর আশ্রয় ছেড়ে তাড়াতাড়ি তিনি কোজেৎকে নিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কোজেৎ ছেলে-মানুষ, সে আর চলতে পারছিল না। অগত্যা ভাল্‌জাঁ তাকে কাঁধে তুলে নিলেন। রাস্তায় লোকজন নেই। জ্যোৎস্না রাত্রি ব'লে গলির মধ্যে আলো জ্বালা হয় নি। তিনি আরও পা চালিয়ে চলতে লাগলেন।

চলতে চলতে তাঁরা এ-রাস্তা সে-রাস্তা ক'রে নদীর তীরে এসে পড়লেন। লোকজনের চলাচল তখন বন্ধ হয়ে এসেছে, পোস্তা তখন

একেবারে খালি। পুল পার হয়ে ওপারে যাওয়াই ঠিক করলেন। ভাগ্যবশে সেই সময় একটা বোঝাই-গাড়ী পুল পার হচ্ছিল। গাড়ীর আড়ালে আড়ালে গেলে অনুসরণকারী তাঁদের দেখতে পাবে না। পুলের উপর মাঝামাঝি পৌঁছে কোজেৎ আর কাঁধে থাকতে পারছিল না, পা দুটা তার ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছিল, তাই তাকে নামিয়ে দিতে হ'ল। তখন তার হাত ধরে ধীরে ধীরে গাড়ীর গা ঘেঁষে এগিয়ে চললেন।

পুল পার হয়ে ডান দিকের রাস্তাটা ধরলেন। একটু গিয়েই একটা খোলা জায়গা, সেখান থেকে পুলটা আগাগোড়া দেখা যায়। একবার পিছন ফিরে সে দিকে তাকিয়ে ভাল ক'রে দেখে নিলেন, কাউকে দেখা গেল না। কিন্তু তবু ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। জাভেয়রকে তিনি বেশ জানেন, সে সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

একটা সরু গলি দিয়ে যেতে যেতে আর একবার পুলের দিকে তাকাতেই অনুসরণকারীদের ছায়ামূর্ত্তি দেখতে পাওয়া গেল। তারা তখন সবে পুলের উপর উঠেছে। ইতিমধ্যে তাঁরা অনেকটা এগিয়ে গিয়ে রাত্রির মত আশ্রয় খুঁজে নিতে পারবেন।

কিন্তু ভালজাঁ ভুল করলেন। গলিটা যে বন্ধ তা তাঁর খেয়াল ছিল না। একটু এগিয়ে যেতেই সামনে উঁচু দেয়াল। পিছু হটে গেলে শিকারীদের মুখে গিয়ে পড়তে হয়। কাজেই, যেমন ক'রে হোক, দেয়াল টপকিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়তেই হবে, তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে

কিন্তু মুশকিল এই, কোজেৎকে নিয়ে দেয়াল টপকাবেন কেমন ক'রে? দেয়ালের গাঁথুনি ভাল ক'রে পরখ করতে করতে পকেট থেকে একটি লোহার তীক্ষ্ণ শলা ও একটি ছোট্ট হাতুড়ি বের করলেন এবং দেয়ালে ঠুকে শলাটি অতি সহজে বসিয়ে চাড় দিতেই একখানা ইট খুলে গেল এবং অমনি ক'রে তার উপরে, তার উপরে—পর পর তিন-চারখানা ইট খুলে সেই গর্ত্তে পা দিয়ে বেয়ে বেয়ে অতি সহজেই দেয়ালের উপর গিয়ে উঠলেন এবং দেয়ালে ওঠবার আগে একটা মোটা দড়ির এক প্রান্ত নিয়েছিলেন কোজেৎ-এর কোমরে বেঁধে আর একপ্রান্ত নিজের হাতে। এবারে সেই দড়ির সাহায্যে অতি সহজেই কোজেৎকে টেনে উপরে তুললেন এবং অপর পাশে নামিয়ে দিয়ে নিজে একটা গাছের ডাল ধরে নীচে নেমে পড়লেন। দেয়াল টপকাবার আগেই পায়ের জুতা ও মোজা ছুঁড়ে ওপাশে ফেলে দিয়েছিলেন।

জাভেয়র ও তার সঙ্গীরা অনেকক্ষণ সেই নিস্তব্ধ সরু গলিটা পদভরে তোলপাড় করে ফেলল, কিন্তু ভাল্‌জাঁর সন্ধান পেল না। দেয়াল টপকাবার সম্ভাবনার কথা তাদের মনেই হ'ল না, কেন-না, সেটা নেহাৎ অসম্ভব ব্যাপার, আর এত তাড়াতাড়ি তা যে কি ক'রে হতে পারে তা জাভেয়রের মত পাকা গোয়েন্দার মাথায়ও এল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কুমারী-আশ্রমে

ভালজাঁ দেয়াল থেকে নীচে নেমে একবার চারদিক তাকিয়ে দেখলেন। সেটি একটি বাগান-বাড়ী, বাগানখানি বেশ বড়ই, কিন্তু নিতান্ত অযত্নে আছে, চারিদিকে আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে সেখানে কতকগুলি ফুলফলের গাছ, খানিকটা জায়গায় শাক-সব্জির চাষ, অদূরে একটি অতি পুরানো ভাঙা ইঁদারা।

বাগানের একপাশে পুরানো একটা বাড়ী, কতকাল আগে যে তৈরী হয়েছিল কে জানে। এখন প্রকৃতির দয়ার ভিখারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় ফাটল, তাতে গাছ গজিয়েছে। এ-হেন বাড়ীতে যে কেউ বাস করে না তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে এই বাড়ীর ছাদহীন চত্বরে নিয়ে গিয়ে কোজেৎকে শুইয়ে দিলেন।

কুয়াশায় বাগানের আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবে অস্পষ্ট-ভাবে একটা বাড়ীর মত অদূরে কি যেন দেখা যাচ্ছিল। বাগানে যে অত রাত্তিরে কেউ নেই তা তার চেহারা দেখেই মালুম হয়।

কোজেৎ শীতে হি হি ক'রে কাঁপছিল এবং বাবাকে তার আঁকড়ে ধ'রে ছিল। ভয়ও হচ্ছিল, তবে অতটুকু মেয়ে জ্ঞান হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ের আশ্রয়ে হাজার রকম দুঃখকষ্টে মানুষ হয়েছিল। তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না। তাছাড়া, দেয়ালের ওপাশে তখনও জাভেয়রের দলের পদধ্বনি ও তাঁদের খুজে না পাওয়ার ব্যর্থ রোষের আভাস পাচ্ছিল। নিজেদের অবস্থাটা সে ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছিল। তাই চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে বিপদ ডেকে আনে নি।

পুলিসের দল যে সব চলে গেল, তাও বোঝা গেল। বাগানের সে নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় তখনকার মত তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

এতক্ষণ তিনি কোজেৎ-এর দিকে নজর দিতে পারেন নি। চুপি চুপি ডাকলেন, 'কোজেৎ!'

কোন জবাব নেই। তার হাত-পা সব বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

কোজেৎ কি তবে বেঁচে নেই!

ভাল্‌জাঁ শিউরে উঠলেন।

সহসা সে নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে মুখরিত ক'রে প্রার্থনাগান শোনা গেল। বাণী তার অস্পষ্ট, কিন্তু সুর তার স্বর্গীয়। সেই অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে নারীকণ্ঠের সে স্তবগান তাঁকে মুগ্ধ করল। কুয়াশার আড়ালে যে বাড়ীখানা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল সেখান থেকেই সুর ভেসে আসছে। ভাল্‌জাঁর মনে হ'ল দানবের অন্তর্ধানের পর এই প্রার্থনা-সঙ্গীত তাঁর সকল ভয় সকল ভাবনাকে দূর ক'রেই যেন অভয় দিচ্ছে—ওরে তোর আর ভয় নেই! তোর ভয় নেই!

ভাল্‌জাঁ তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। সঙ্গীতের সুর যে কোথা থেকে আসছে, এবং কিসের তা তাঁরা কেউ বুঝতে পারলেন না। একজন অনুতপ্ত আর একজন নির্ম্মল নিষ্পাপ, উভয়েরই মনে হ'ল, তাঁদেরও প্রার্থনায় যোগ দেওয়া উচিত। তাঁদের মনে হ'ল, এ প্রার্থনা, এ সঙ্গীত যেন মানুষের সকল পাপ সকল দুঃখকে ধুয়ে মুছে দিবে।

গান থেমে গেল। কতক্ষণ যে চলেছিল ভাল্‌জাঁ তা বলতে পারেন না। সত্যিকার আনন্দ অনেকক্ষণ ধ'রে হ'লেও লোকের মনে হয়, মুহূর্ত্তেই যেন শেষ হয়ে গেল।

আবার সব চুপচাপ। বাগানের কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, রাস্তাঘাট নিঃঝুম। তাঁর মনে আর কোন ভয় ভাবনা রইল না; বাতাসে শুকনাপাতার খসখস শব্দ—তাতেও যেন একটা করুণ সুর।

একটু পরেই বাতাস আরও জোরে বইতে সুরু করল। রাত কত হয়েছে—কে জানে। কোজেৎ এতক্ষণ কিছুই ব'লে নি, নীরবে বাবার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল। তাঁর মনে হ'ল হয় ত মেয়ে তাঁর ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সে ঘুমায় নি, তবে চাউনি থেকে মনে হয় যে, সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। সে কাঁপছিল।

কোজেৎকে আদর ক'রে বৃদ্ধ শুধালেন, 'ঘুম পেয়েছে মা?'

সে জবাব দিল, 'ভারী শীত করছে বাবা!'

ভাল্‌জাঁ তাড়াতাড়ি নিজের গা থেকে কোটটি খুলে তা দিয়ে মেয়েকে ঢেকে দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শীত কি এখন একটু কম বোধ হচ্ছে না মা ?'

'হাঁ, বাবা।'

অদূরে একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। শব্দটা বাগান থেকেই আসছে। খুব জোরে নয়। শব্দ লক্ষ্য করে সেই দিক তাকাতেই ভাল্‌জাঁ দেখতে পেলেন কে একজন বাগানে শাকসব্জি তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে।

ভাল্‌জাঁ আঁতকে উঠলেন। বিপদ কি তাঁকে কিছুতেই ছাড়বে না! মানুষকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ লোকটা হয় ত তাঁকে দেখতে পেয়ে এখনই 'চোর চোর' ক'রে চেঁচিয়ে উঠবে। পুলিস আসবে, গ্রেফতার ক'রে তাদের ধরে নিয়ে যাবে।

কোজেৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারা!

ভাল্‌জাঁ কোজেৎ-এর শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করলেন—বড় ক্ষীণ, বড় দুর্ব্বল। যে-কোন মুহূর্ত্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেমন ক'রে একটু আগুন পাওয়া যায়, কোজেৎকে উত্তপ্ত করতে না পারলে সে বাঁচবে না।

তিনি সটান্ সেই লোকটির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি নীচু হয়ে কি করছিল, ভাল্‌জাঁর উপস্থিতি টের পায় নি। ভাল্‌জাঁ পকেট থেকে গোটা কয়েক টাকা বের ক'রে তার সুমুখে ধরে কাকুতি করে ব'লে উঠলেন, 'আপনি কে জানি নে। আজ রাত্তির মত আমাকে আর আমার বালিকা কন্যাকে একটু আশ্রয়

দিন। তার বিনিময়ে এই টাকা কয়টি দিচ্ছি, আরও চান ত কাল সকালে দিব।'

এই সময় জ্যোৎস্না এসে ভাল্‌জাঁর মুখখানিকে আলোকিত ক'রে দিল। লোকটি তাঁকে চিনতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ব'লে উঠল, 'ফাদার মাদ্‌লেন! আপনি! আপনি কোত্থেকে?'

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে নিজের পরিত্যক্ত নাম উচ্চারিত হতে দেখে তিনি চম্‌কে উঠলেন। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? এ কার বাড়ী?'

'কি আশ্চর্য্য! ফাদার মাদ্‌লেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না! আমি ফোশল্‌ভাঁ! আপনি একদিন আমায় গাড়ীর চাকার নীচে থেকে রক্ষা করেছিলেন, মনে পড়ে না?

এতক্ষণে ভাল্‌জাঁ লোকটিকে চিনতে পারলেন।

ফোশল্‌ভাঁ বলল, 'আপনিই ত আমায় এখানে মালীর কাজ জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন। আপনি সব ভুলে গেছেন ফাদার-মাদ্‌লেন? আপনার এ বেশ কেন? মাথায় টুপি নেই, গায়ে জামা নেই, কোথা থেকে আসছেন, আর এখানেই বা এলেন কেমন ক'রে?'

ভাল্‌জাঁ জবাব দিলেন, 'আর বলতে হবে না, সব মনে পড়েছে। এত রাত্রে তুমি কি করছিলে?'

'তরমুজের ক্ষেতে তরমুজ তদারক করছিলাম।'

'তোমার হাঁটুতে ঘণ্টা বাঁধা কেন?'

'ঘণ্টার শব্দ শুনে তাঁরা সরে যেতে পারবেন বলে।'

'তারা কারা?'

'এখানে কেবল স্ত্রীলোক থাকেন কি-না, পুরুষ তাঁদের দেখতে নেই।'

'এখানে কারা থাকেন?'

'এটা কুমারী-আশ্রম। কিন্তু ফাদার মাদ্‌লেন, বলুন ত আপনি কেমন ক'রে এখানে ঢুকলেন? এখানে ত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।'

'তুমি যে রয়েছ?'

'আমি ছাড়া।'

ভাল্‌জাঁ তার সুমুখে এগিয়ে গিয়ে তাকে বললেন, 'ফোশল্‌ভা, ভাই, একদিন তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম, আজ তুমি আমায় বাঁচাও।'

'ফাদার মাদ্‌লেন, আপনার কি উপকার করতে পারি বলুন—জীবন দিয়েও যদি আপনার কোন কাজে আসতে পারি ত পরম ভাগ্য বলে মনে করব।'

'সব তোমায় বলছি। তোমার থাকবার আলাদা ঘর আছে ত?'

'ওই কোণে জঙ্গলের মধ্যে আমার একখানি কুঁড়ে আছে।'

'ভাল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আমি কেমন ক'রে এখানে এলাম তা জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, আর আমার আসার কথা কাউকে বলবে না।'

'বেশ, তাই হবে। আমি নিশ্চয় জানি, আপনি কখনও সৎ ছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন না।'

'তবে আমার সঙ্গে এস। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে আসি।'

সে আর কিছু না বলে ভাল্‌জাঁর পিছনে পিছনে চলল।

কোজেৎকে কোলে ক'রে ফোশল্‌ভাঁর কুটীরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে আগুনের তাপে কোজেৎ পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

বহুকাল পরে এক অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবন রক্ষকের দেখা পেয়ে কৃতজ্ঞ ফোশল্‌ভাঁ আনন্দে আটখানা হ'ল। পানভোজনে ও গল্প ক'রে তারা অনেক রাত জাগল।

ফোশল্‌ভাঁ বার বার বলছিল, 'আপনি লোকের জীবন রক্ষা করেন, পরে আর তাদের চিনতে পারেন না!'

ভাল্‌জাঁ বৃদ্ধের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা দেখে একটু মুচকি হাসলেন।

আশ্রমের প্রধানা কুমারীর কাছে ফোশল্‌ভাঁ ভাল্‌জাঁকে ছোটভাই বলে নিজের সাহায্যের জন্যে কাছে রাখবার অনুমতি ভিক্ষা করল এবং সে সততার সঙ্গে এতদিন কাজ করে এসেছে, কাজেই প্রধানা কুমারী তার প্রার্থনায় আপত্তি করলেন না। কোজেৎ আশ্রমের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'ল।

দেখতে দেখতে তাঁদের পাঁচ বছর কেটে গেল। বৃদ্ধ ফোশল্‌ভাঁর মৃত্যুর পর ভাল্‌জাঁ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে কোজেৎকে নিয়ে আশ্রম ত্যাগ ক'রে কোথায় চলে গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মারিউস্

কুমারী-আশ্রমের চাকরি ছেড়ে এসে ভাল্‌জাঁ প্যারিসে দু-তিনটে বাসা ভাড়া নিলেন, কখন কি প্রয়োজন হয় বলা ত যায় না।

এখন তাঁর নাম ফোশল্‌ভাঁ। কোজেৎকে মানুষ ক'রে তোলাই যেন এখন তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ, শুধু এই জন্যেই যেন তিনি বেঁচে আছেন।

কোজেৎ এখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তাকে দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। তার সঙ্গে বারো পঁমেয়র্‌সির একমাত্র পুত্র এবং মঁসিয়ো জিল্‌নরমাঁর একমাত্র দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী মারিউস্-এর ভারী ভাব হয়েছে এবং কালক্রমে এই ভাব সত্যিকারের ভালবাসায় পরিণত হয়েছে।

ভাল্‌জাঁ প্রথমত তাদের এ ভালবাসাকে সমর্থন করেন কি—কেন-না, তাঁর ভয় ছিল, পাছে কোজেৎকে হারাতে হয়। কোজেৎকে হারালে তাঁর বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে।

তা ছাড়া, মারিউস্ অভিজাতের উত্তরাধিকারী, যদি সে কোজেৎকে উপেক্ষা করে, যদি অনাদর করে!

তারপর ১৮৩২ সালের জুন মাস এল। প্যারিসের সর্ব্বত্র বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজসৈন্যের লড়াই হতে লাগল। দেখতে দেখতে কত লোক যে হতাহত হ'ল কে তার হিসাব রাখে ?

ঠিক এই সময় একদিন মারিউস্ কোজেৎ-এর সঙ্গে বিবাহের দাবী দাদা মশায়ের কাছে পেশ করল। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, তার দাদামশায় একজন পাকা অভিজাত। তিনি কোজেৎ-এর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে যা জানতে পারলেন, তাতে খুশী হতে পারলে না। নাতীকে রেগে বলে দিলেন, 'এ বিয়ে হতে পারে না, হবে না। যদি তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর, তাহলে তোমায় আমি ত্যাগ করব। আমায় তুমি জান, সুতরাং আশা করি, অবাধ্য হবে না।'

দাদা মশায়কে সে অনেক ক'রে বুঝাল, কিন্তু কোনই ফল হ'ল না। তিনি হাঁকিয়ে দিলেন।

তখন দাদা মশায়কে জব্দ করবার জন্যে সে বিদ্রোহী-দলে যোগ দিল। এবং সেই দিনই এক দলের দলপতি হয়ে রাজ-সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে গেল।

কোজেৎ মারিউস্‌কে ভালবাসে, কাজেই ভাল্‌জাঁ যখন শুনতে পেলেন যে, মারিউস্ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে তখন তাকে রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দূর থেকে লড়াই দেখতে লাগলেন।

তিনি গিয়ে দেখলেন, ইন্সপেক্টর জাভেয়রকে গুপ্তচর সন্দেহে বিদ্রোহীরা হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে রেখেছে। বিচারে তার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

বিদ্রোহীদের অনেকেই ভাল্‌জাঁকে চিনত। তিনি তাদের কাছে জাভেয়রের প্রতি যে শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে সেই শাস্তি নিজের হাতে দিবার প্রস্তাব করলেন। বালা বাহুল্য, তারা তৎক্ষণাৎ তাঁকে অনুমতি দিল।

একটি পিস্তল নিয়ে তিনি বন্দী জাভেয়রকে অদূরের একটি সরু গলিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে জাভেয়রের হাতপায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তিনি তাকে—তাঁর পরম শত্রুকে—বললেন, 'ইন্সপেক্টর জাভেয়র, তুমি মুক্ত। যেখানে খুশী চলে যাও। আমাকে যদি তোমার প্রয়োজন হয় ৬ ফোশল্‌ভাঁ নামে এই ঠিকানায় খোঁজ করলেই আমায় পাবে।'

এই ব'লে তিনি তার আসল ঠিকানা তাকে বলে দিলেন।

তারপর পর পর দুটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রে গলি থেকে চলে এলেন।

জাভেয়র আপন মনে বলতে লাগল, এই দেবতার মত মানুষটি, যিনি তাঁর চিরশত্রুকে হাতে পেয়েও তার প্রতি এত দয়া দেখালেন, পরম বন্ধুর মত আচরণ করলেন, কত শত সৎ কাজে যাঁর বিচিত্র জীবন পূর্ণ—শুধু নির্ম্মম কর্ত্তব্যের খাতিরে, চাকরির খাতিরে, যশের

খাতিরে, সেই তাঁকেই সারা জীবন ধরে নির্য্যাতন করে আসছি, ধিক আমার জীবনে !

জাভেয়র খানিকক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে বৃদ্ধের যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল, পরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

রাজসৈন্যের হাতে বিদ্রোহীরা সেদিনকার মত পরাজিত হ'ল। মারিউস্ আহত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। রাজসৈন্য পলায়নপর বিদ্রোহীদের পিছনে ধাওয়া ক'রে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

ভাল্জাঁ তাড়াতাড়ি মারিউসকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং জনতার মধ্যে থেকে আহত মারিউস্কে নিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু সুমুখে পিছনে সর্ব্বত্রই রাজসৈন্য ঘাটি আগলে রয়েছে। চারদিকে কেবল মারামারি কাটাকাটির দৃশ্য। মারিউস্কে নিয়ে কেমন ক'রে এখান থেকে বেরুবেন তাই ভেবে ভাল্জাঁ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

তবে বহু বছর ধরে তিনি জেলখানায় কয়েদী ছিলেন, পলায়নের অনেক উপায় জানতেন। আজকে সে জানা কাজে এল। যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেস্থান থেকে একটু দূরে রাস্তার উপর নর্দ্দমার একটি বড় ঝাঁজরি দেখতে পেলেন। অতিকষ্টে জনতার মধ্যে থেকে বের হয়ে সেই ঝাঁজরির কাছে গিয়ে তার ঢাক্না তুলে ফেললেন। নর্দ্দমা দিয়ে একটি মানুষ অনায়াসেই নীচে নেমে যেতে পারে। যারা নর্দ্দমা পরিষ্কার করে তারা এই পথেই

যাতায়াত করে। ভাল্‌জাঁ মরণাপন্ন মারিউস্‌কে কাঁধে ফেলে এই গর্ত্ত দিয়ে মাটির নীচেকার সুরঙ্গ পথে নেমে গেলেন। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কোন প্রকারে দিক ঠিক ক'রে নর্দ্দমার মুখের দিকে এগিয়ে চললেন। নর্দ্দমার দুর্গন্ধময় কাদায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ লেপে গেল, ঘোলাটে জলে জামাকাপড় ভিজে গেল। অন্ধকারে আন্দাজে পা টিপে টিপে যে দিকে নর্দ্দমার গড়ান সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ভাল্‌জাঁ নর্দ্দমার মুখ পাবার আশায় চলতে লাগলেন। তাঁর কাঁধের উপর আধমরা অবস্থায় মারিউস্। সহসা দূরে ক্ষীণ আলো দেখে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হ'ল।

ভাল্‌জাঁর অনুমান ঠিকই। নর্দ্দমার একটা মুখে এসে পড়লেন বটে, কিন্তু বার হবার উপায় নেই,—একটা প্রকাণ্ড লোহার ঝাঁজরি দ্বারা নর্দ্দমার মুখ বন্ধ। সেই ঝাঁজরি আবার একটি বড় তালা দিয়ে আটকান। ভিতর থেকে সে তালা ভাঙবার কোন উপায়ই নেই। ভাল্‌জাঁ ভাবলেন, শেষে কি এই নর্দ্দমার মধ্যেই মরতে হবে ?'

নর্দ্দমার বাইরেই খোলা বাতাস, চাঁদের আলো!

নর্দ্দমার এক পাশে একটু জায়গা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তিনি মারিউস্‌কে শুইয়ে দিলেন। দু-হাতে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই লোহার কবাট ঠেলতে লাগলেন। ব্যর্থ চেষ্টা! তাঁর এত পরিশ্রম এত কষ্ট—সব বুঝি ব্যর্থ হতে চলল। তালা খুলে ফেলা ছাড়া পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নেই। যে সব অস্ত্রের সাহায্যে তা সম্ভব হ'ত সে সমস্তই তাঁর কাছে সর্ব্বদা মজুত থাকে। কিন্তু

যখন সে সব অস্ত্র তাঁর জীবনে একান্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল, তখনই সে সব তাঁর কাছে নেই। সেদিন যখন পোষাক বদলে লড়াইয়ের পোষাক প'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন তখন সেগুলির কোন প্রয়োজন নেই মনে ক'রে সঙ্গে আনেন নি। মারিউসের পকেট হাতড়ে দেখলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু একখানা রুটি, গোটাকয়েক টাকা, আর একখানি নোটবুক ছাড়া কিছুই পেলেন না। কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না। মারিউসের পকেটবুকখানা খুলে আপন মনেই নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি লেখার উপর তাঁর নজর পড়ল। পকেট-বুকের একটি পাতায় লেখা আছে—

'আমার নাম মারিউস্ পঁমেয়র্‌সি। আমার মৃতদেহ ৬ নম্বর রুয়-দে ফীয়্‌-দ্যু কালভেয়র-এ আমার মাতামহ মঁসিয়ো জিল্‌নরমঁার কাছে পৌঁছে দিবেন।'

ভাল্‌জাঁ ঝাঁজরির অস্পষ্ট আলোয় লেখাটি পড়লেন। খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, পুনরায় পকেটবুকের লেখাটি আপন মনে আওড়ালেন। তারপর পকেটবুকখানা মারিউসের পকেটে রেখে দিলেন। মারিউসের পকেটে যে রুটিখানা পেয়েছিলেন ক্ষুধার তাড়নায় তা শুধু শুধুই খেয়ে ফেললেন। অতঃপর কি ভেবে মারিউস্‌কে কাঁধে নিয়ে নর্দ্দমার গড়ানের দিকে এগিয়ে চললেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জাভেয়রের পরিণাম

অবশেষে ভাল্‌জাঁ নর্দ্দমার শেষপ্রান্তে—সেন্ নদীর তীরে মুক্ত বাতাসে মুক্ত আলোর মধ্যে বার হয়ে এলেন।

অজ্ঞান মারিউস্‌কে নদীর তীরে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন। আঁজলা ভরে নদী থেকে জল এনে তার চোখে মুখে ঝাপটা দিলেন। তখন অতি ক্ষীণ ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বইছিল। ভাল্‌জাঁ আবার জল তুলছিলেন এমন সময় কে এসে তাঁর কাঁধে হাত দিল। তিনি ঘাড় ফিরিয়েই দেখলেন—স্বয়ং ইন্সপেক্টর জাভেয়র।

জাভেয়র কিন্তু ভাল্‌জাকে দেখে চিনতে পারে নি—কেন-না, তাঁকে তখন কারুরই চিনবার জো ছিল না।

জাভেয়র জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

'আমি জাঁ ভাল্‌জাঁ!'

নাম শুনে জাভেয়র একবার তাঁর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এতক্ষণে তাঁকে চিনতে পারল।

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'ইন্সপেক্টর জাভেয়র, আমি তোমার বন্দী। তাছাড়া, সকাল থেকেই আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। তা না হ'লে আমি তোমায় আমার ঠিকানা দিতাম না। আমি ধরা দিতে প্রস্তুত, তবে আমায় একটি ভিক্ষা তোমাকে দিতে হবে।'

জাভেয়র জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি?'
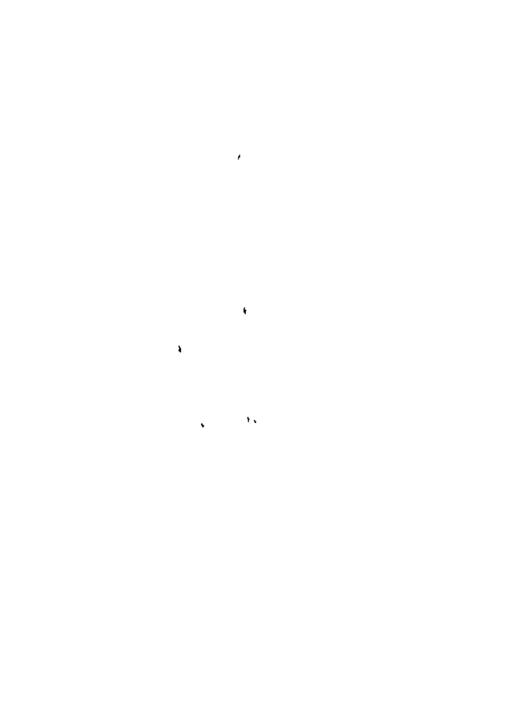
জাভেয়র ভাল্‌জাঁর কোন কথাই যেন শুনতে পেল না। তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত ব'লে মনে হ'ল। সে এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ অবস্থাটা তার জীবনে সম্পূর্ণ নতুন।

খানিক বাদে জাভেয়রের চমক ভাঙল, সে বলল, 'তুমি এখানে কি করছিলে? আর এই লোকটিই বা কে?'

ভাল্‌জাঁ জবাব দিল, তার কণ্ঠস্বরে জাভেয়রের চেতনা ফিরে এল।—

'এই লোকটির সম্বন্ধেই একটি অনুরোধ তোমায় করতে চাই। আমায় নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করতে পার, কিন্তু তার আগে একে এর বাড়ী পৌঁছে দিতে যে সময়টুকু লাগে সেই সময়টুকু আমায় দাও। বলা বাহুল্য, তুমিও আমার সঙ্গে এস। একে পৌঁছে দিয়েই আমি তোমার হাতে ধরা দিব।'

জাভেয়র বললে, 'এ লোকটাকে ত আজই বিদ্রোহী দলে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। এর নাম কি মারিউস্‌?'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'হাঁ। আমি একে সেখান থেকেই নিয়ে এসেছি। ভয়ানক ভাবে আহত হয়েছে।'

জাভেয়র বলল, 'আহত কি রকম, আমি ত দেখছি লোকটা মারা গেছে।'

ভাল্‌জাঁ জবাব দিলেন, 'না, এখনও মরে নি। এর বাড়ী ৬ নং রু্য-দে ফীয়্‌ দ্যু-কালভেয়র। এর দাদামশাইয়ের নাম মঁসিয়ো জিল্‌নরমাঁ।'

অদূরে একখানি ভাড়াটে গাড়ী অপেক্ষা করছিল। জাভেয়র হাঁকল, 'কোচ্‌ম্যান!'

কোচ্‌ম্যান গাড়ী নিয়ে এল। ভাল্‌জাঁ ও জাভেয়র দুজনে ধরাধরি ক'রে মারিউস্‌কে গাড়ীর পিছনের আসনে শুইয়ে দিলেন এবং নিজেরা সুমুখের আসনে গিয়ে পাশাপাশি বসলেন। কোচ্‌ম্যানকে ঠিকানা বলে দিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী এসে জিল্‌নরমাঁর বাড়ীর ফটকে উপস্থিত হ'ল। রাত তখন দুপুর হয়ে গেছে, বাড়ীর সকলেই ঘুমাচ্ছে।

জাভেয়র গাড়ী থেকে নেমে কড়া নাড়তেই দরোয়ান চোখ কচলাতে কচলাতে এসে ফটক খুলে দিল।

জাভেয়র তাকে বলল, 'ভিতরে গিয়ে মঁসিয়োকে খবর দাও, তাঁর নাতীকে নিয়ে এসেছি, যুদ্ধে সে আহত হয়েছে।'

দরোয়ান ভিতরে গিয়ে মঁসিয়োর ভৃত্যদের ডেকে নিয়ে এল। সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে তারা মারিউস্‌কে উপরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শুইয়ে দিল এবং কে একজন ডাক্তার ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এই আকস্মিক বিপদে মঁসিয়ো জিল্‌নরমাঁ কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। একমাত্র আদরের নাতীর জন্যে তিনি মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। তিনি তখন ভুলে গেলেন যে তিনি রাজভক্ত অভিজাত, আর তাঁর নাতী মারিউস বিদ্রোহী। তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমস্ত প্রতিষ্ঠার বিনিময়েও তিনি যদি মারিউসকে ফিরে পান! শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের ডেকে পাঠালেন।

ভাল্‌জাঁ ও জাভেয়র নীচে এসে গাড়ীতে উঠতে যাবেন এমন সময় ভাল্‌জাঁ বললেন, 'ইন্সপেক্টর জাভেয়র, এতই যখন দয়া করলে, তাহ'লে আর একটি মাত্র অনুরোধ রক্ষা কর। আমায় মিনিট কয়েক সময় দাও, একবার বাড়ী যাব।'

জাভেয়র খানিকক্ষণ কি ভাবল, পরে কোচ্‌ম্যানকে ভাল্‌জাঁর ঠিকানা বলে গাড়ী হাঁকাতে হুকুম দিল।

পথে কেউ কারুর সঙ্গে একটি কথাও কইলেন না। উভয়েই চিন্তিত।

যে গলিতে ভাল্‌জাঁ বাস করেন সেই গলিটি সরু, গাড়ী তাতে ঢুকবে না। সুতরাং গলির মুখেই তাঁরা নেমে গাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিলেন।

বাড়ীতে গিয়ে কড়া নাড়তেই দরোয়ান এসে দরজা খুলে দিল। জাভেয়র নীচে তাঁর অপেক্ষা করবে বলায় দ্বিরুক্তি না ক'রে ভাল্‌জাঁ উপরে উঠে গেলেন।

ভাল্‌জাঁ অবাক হয়ে গেলেন, কেন-না, জাভেয়রের পক্ষে আসামীর প্রতি এতটা ভদ্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

উপরে উঠে জানালা দিয়ে বাড়ীর সামনেকার আলোতে ভাল্‌জাঁ দেখতে পেলেন জাভেয়র চলে গেল।

ভাল্‌জা উপরে উঠে যেতেই জাভেয়র মুহূর্ত্তকয়েক মাত্র সেখানে চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, পরে ধীরে ধীরে গলি ধরে চলতে লাগল।

জীবনে এই প্রথম তাকে চিন্তায় আকুল হতে দেখা গেল। হাত দুখানা পিছনে নিয়ে সে চলেছে। আজ জাভেয়রের সর্ব্বাঙ্গে যেন পরিবর্ত্তন দেখা গেছে, এ রকমটা একেবারে নতুন। তার মুখে চোখে কে যেন কালীর পোছ দিয়ে লেপে দিয়েছে।

নরঘাতক দস্যু আজ তার জীবন দান করেছে! এবং সেই ঋণের বিনিময়ে আজ তাকে কর্ত্তব্য ভুলে জেনে শুনে বাধ্য হয়েই সেই অপরাধীকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে! ন্যায়ের চক্ষে আজ জাভেয়র দস্যু জাঁ ভালজাঁর সঙ্গে সমতুল্য।

একটা বিষয় আজ জাভেয়রকে অবাক করে দিয়েছে। ভাল্জাঁ তাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিল। আর তার সব চাইতে বড় বিস্ময় এই যে, জাভেয়রও আজ বাধ্য হয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁর জীবন দান করল—হাতে পেয়েও দস্যুকে ছেড়ে দিল!

জাভেয়র আজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছে। ভাল্জাঁ আইনের চক্ষে অপরাধী, তা জেনেও আজ আইন অমান্য ক'রে অপরাধীকে সে ছেড়ে দিল। জীবনে যে কাজ কখনও সে করিতে পারে না, তাই তাকে করতে হ'ল। আজ তার বেঁচে থাকা নিরর্থক।

এ অপমান অসহ্য। জীবনের প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেল। আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই তার নেই।

একদিকে জাঁ ভাল্জাঁর কাহিনী অন্য দিকে মঁসিয়ো মাদ্লেনের নানা সদনুষ্ঠান—দুটাই পর পর তার মনে হ'ল। আর দুয়ে মিলে ফোশল্ভাঁও তার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করলেন। ও দিকে দস্যু দাগী চোর ভাল্জাঁকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে তাকে

চাকরি করে জীবন রক্ষা করতে হবে। অসম্ভব, সে তা কিছুতেই পারবে না।

রাত দুপুর। জগৎশুদ্ধ সকলে ঘুমে অচেতন। রাজপথ জনশূন্য, নীরব। অদূরে সেন্ নদীর উপরের পুলটি দেখা যাচ্ছে। জাভেয়র গিয়ে পুলের উপর দাঁড়াল। টুপি খুলে একপাশে রেখে দিল। মাথার মধ্যে তার দুঃসহ বেদনা অনুভব করতে লাগল। মনে হ'ল ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা ঠাণ্ডা হতে পারে, কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়া দূরে থাকুক আরও বেড়ে গেল।

বর্ষার সেন্ আজ কূলে কূলে পূর্ণ। জাভেয়র পুলের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল ঠিক তার নীচেই সেন্ নদীর গভীর দহ। জাভেয়র রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে সেন্-এর তরঙ্গউচ্ছ্বাস দেখতে লাগল।

রাত্রি অন্ধকার। চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয়—আজ সেন্ও তার বিশাল মুখ বাড়িয়ে যেন জাভেয়রকে গিলে ফেলতে চাইছে। জাভেয়র মিনিট কয়েক কি ভাবল। হঠাৎ তার মুখে একটি স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন দেখা গেল। মুখখানা প্রশান্তিতে ভরে উঠল। একবার দু-হাত জোড় ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে জাভেয়র নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ঝপ্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

রাক্ষুসী সেন্ যেন একটা বিকট হাসি হেসে জাভেয়রকে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস ক'রে ফেলল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যবনিকা

অনেকদিন রোগ ভোগের পর মারিউস্ পঁমেয়রসি সুস্থ হয়ে উঠল। এবং ১৮৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কোজেৎ-এর সঙ্গে তার শুভ বিবাহ হয়ে গেল। মঁসিয়ো ফোশল্ভাঁ এই বিবাহে বর-ক'নেকে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা যৌতুক দিলেন।

বিবাহের পর একদিন তিনি মারিউসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নিজের জীবনের কথা, কোজেৎ-এর কথা—একে একে সব কিছুই তিনি মারিউস্কে জানালেন।—তিনি কোজেৎ-এর পিতা নন, কোজেৎ তাঁর পালিতা কন্যা, চুরির দায়ে তিনি উনিশ বছর জেল খেটেছেন, পরে আরও একটি অপরাধে তাঁর সারা জীবন কয়েদ-বাসের আদেশ হয়, তিনি জেল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—সমস্ত একে একে ভাল্জাঁ মারিউস্কে জানালেন।

'সব কথা ত শুনলে, এখন বল, আমার কি কোজেৎ-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত?'

মারিউস্ ইতস্তত ক'রে বলল, 'এ অবস্থায় সম্পর্ক যত কম থাকে ততই বোধ হয় ভাল।'

সে তখনও জানতে পারে নি যে, এই ভাল্জাঁই তার জীবন-রক্ষক।

ভাল্‌জাঁ কোজেৎ-এর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ ক'রে দিলেন। অথচ বেচারা কোজেৎ বাবার অনুপস্থিতির কোন কারণই জানতে পারল না। মারিউস্‌ও তাকে কিছুই বলে নি।

কিন্তু একদিন এক আশ্চর্য্য উপায়ে মারিউস্ ভাল্‌জাঁ সম্বন্ধে সব কথাই জানতে পারল। দাগী চোর হলেও এঁর কার্য্যাবলী অনন্য-সাধারণ, ইনি মহানুভব। এই আত্মভোলা পরোপকারী লোকটিই কয় মাস আগে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে বিদ্রোহের সময় তাকে বাঁচিয়েছিলেন। কেন-না, মারিউস্‌কে তাঁর কন্যা ভালবেসেছিল।

মারিউস্ সব কথা শুনে তখনই সেই মহাত্মার পায়ের ধূলা নিয়ে জীবন ধন্য করবে মনে ক'রে কোজেৎকে সঙ্গে নিয়ে ভাল্‌জাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল।

এদিকে মাসখানেক ধ'রে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচবেন না।

মারিউস্ ভাল্‌জাঁর শয়ন-ঘরের দরজার কড়া নাড়ল।

ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে ভাল্‌জাঁ বললেন, 'কে? ভিতরে আসুন।'

দরজা খুলে কোজেৎ ছুটে গিয়ে বৃদ্ধের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মারিউস্ দরজার চৌকাট পার হয়ে ভিতরে এসে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাল্‌জাঁ একখানা আরাম চৌকীতে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে

ছিলেন। তাঁর হাত দুখানি চেয়ারের হাতলে ঝুলে রয়েছে, শরীর ক্ষীণ, মুখ ফ্যাঁকাশে, কিন্তু তাঁর চোখ দুটি থেকে আনন্দ ফেটে বেরুচ্ছে।

কোজেৎ কাঁদ কাদ স্বরে ডাকল, 'বাবা!'

'কে, কোজেৎ! মা, এলি! কই, মারিউস্ আসেনি?'

মারিউস্ অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে নজর পড়তেই বৃদ্ধ বলে উঠল, 'এই যে বাবাও এসেছ! বাঃ বাঃ, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? আমায় কি আজও ক্ষমা করতে পারলে না বাবা!'

বাঁধ ভেঙে গেল। কোজেৎ পিতার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। মারিউস্ ঠায় দাঁড়িয়ে পিতা-পুত্রীর এই উত্তাল উচ্ছ্বাস দেখতে লাগল। তার নিজের চোখ বেয়েও অশ্রু ঝরে পড়বার উপক্রম হ'ল।

কোজেৎ কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবা!—'

সে আর বলতে পারল না।

'তুইও আমায় ক্ষমা কর্ মা!'

কোজেৎ গায়ের শালখানা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে চেয়ারের হাতলে বসে বৃদ্ধের মাথার চুলগুলি সুবিন্যস্ত ক'রে দিতে লাগল। ভাল্জাঁ এতটুকু আপত্তি করলেন না। বহুদিন পর কোজেৎ-এর আদর পেয়ে বুড়া আনন্দে এতটা অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, কথা তাঁর মুখ থেকে ঠেকে ঠেকে বের হতে লাগল, 'আমি কি নির্বোধ! তোকে আমি আর দেখতে পেলাম না এটাই কেন যে আমার মনে হ'ল তাই ভাবছি। শোন মারিউস্, তোমরা

যখন এসে কড়া নাড়লে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমি কি ভাবছিলাম, জান ?—ভাবছিলাম, সব ত শেষ হয়ে গেল, তোমাদের আর দেখতেও হয় ত পেলাম না। ওই দেখ, ওর ছেলেবেলার জামাটি। একটু আগে এটিকে বুকে চেপে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, কোজেৎকে ত আর বুকে ধরতে পেলাম না, তার জামাটিই আমার সে অভাব পূরণ করুক। ঠিক তোমাদের আসবার একটু আগেই ভাবছিলাম এ সব। কি বোকা আমি! মানুষ বোকা হ'লে কি হয়, ভগবান ব্যবস্থা করেন অন্য রকম। দুঃখে কষ্টে পড়লে মানুষ ভাবে দুনিয়ার সকলেই বুঝি তাকে পরিত্যাগ করেছে। না, তা ত হয় না। মনে মনে একান্তভাবে আমি যে কামনা করেছি, ভগবান্‌ সেই জেনেই না আমার কামনা পূর্ণ করলেন, তোমরা এলে। আজ শুধু আমার মাকে নয়, আমার সেই দশ বছর আগেকার কোজেৎকেও যে ফিরে পেলাম। তোমাদের দেখতে না পেলে কি কষ্টই না হত আমার।'

বলতে বলতে বৃদ্ধ একটু অবসন্ন হয়ে পড়লেন, একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন।

'একান্ত ক'রেই কোজেৎকে আমার শেষ সময়ে দেখতে চেয়েছিলাম। আপনাকে আপনি এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, তারা ত তোমায় চায় না, তবে তুমি কেন তাদের জন্যে কেঁদে মর! চিরদিনই যে তারা তোমার খেজ্‌মৎ করতে পারবে এটা আশা করাও ত তোমার উচিত নয়। কিন্তু ভগবানের কি অসীম করুণা! তাকে আবার দেখতে পেলাম। বাঃ, সুন্দর জামা

পরেছিস্ ত মা-মণি! এ রঙটা আমার ভারী ভাল লাগে মারিউস্ কিনে দিয়েছে, না? ওর বেশ পছন্দ!'

কোজেৎ জবাব দিল, 'কিন্তু বাবা, তুমি কি নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুর তুমি হ'লে কেমন করে, আমি কেবল তাই ভাবি! যে তুমি তোমার কোজেৎকে একমুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করতে না, সেই তুমি আজ কত দিন তাকে একটিবার দেখতেও যাও নি। এতদিন কোথায় ছিলে বাবা? আগে তিন-চার দিনের বেশী আমায় না-দেখে থাকতে পারতে না, কিন্তু এবারে কত দিন হয়েছে জান? চাকরটাকে কত দিন পাঠিয়েছি তোমার খবর নিতে, কিন্তু প্রতিবারেই একই জবার নিয়ে সে গেছে, 'কর্ত্তা ফেরেন নি।' কবে এলে? কোথায় গেছলে? একটা. খবরও কি দিতে নেই? কি অপরাধ করেছি আমি? তোমার শরীর যে এমন ক'রে ভেঙে পড়েছে, তা কি তুমি জানতে না? না, তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ, এবার থেকে তোমায় দস্তুর মত শাসন করতে হবে। এত অসুখ তোমার, আর আমাদের একটু খবর দিলে না! ভাগ্যিস আজ এসে পড়েছিলাম, তাই!'

ভাল্‌জাঁ মারিউসের পানে তাকিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, 'তুমি সত্যি এলে মারিউস্? আমার সকল দোষ সকল ক্রটি ক্ষমা করতে পেরেছ ত?'

এতক্ষণ মারিউস্ কোন কথা বলবার সুযোগ পায় নি, এবার বাঁধমুক্ত স্রোতের জলের মত তার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস পথ পেল। সে বলতে লাগল, 'শুনছ কোজেৎ, উনি আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন!

জান, উনি আমার জন্যে কি করেছেন?—উনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আরও অনেক কিছু করেছেন,—তোমাকে আমার হাতে দিয়েছেন। কিন্তু জীবন বাঁচিয়ে এবং তোমায় দিয়ে নিজের জন্যে কি করেছেন জান?—নিজেকে বলি দিয়েছেন। এই মানুষ! আর আমি, আমার দয়া নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, সহানুভূতি নেই, কিচ্ছু নেই—সেই আমাকেই কি না উনি বলছেন, 'ক্ষমা ক'র!' সারাজীবন ওঁর পদসেবা করলেও উনি আমার জন্যে যা করেছেন তার তুলনা হয় না। সেই যুদ্ধক্ষেত্র, সেই পূতিগন্ধময় নর্দ্দমা, সেই অন্ধকূপ—সব তিনি উপেক্ষা করেছেন শুধু তোমার ও আমার জন্যে, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে সেই দিন কত কষ্টই না সয়েছেন শুনলে বিস্মিত হবে। বিশ্বাস করতে চাইবে না। বলবে, মানুষ কি তা পারে? কিন্তু উনি পারেন। উনি মানুষ নন,—মানুষের আকৃতিতে দেবতা। কি দুর্জ্জয় সাহস, কি অসীম কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, কি অকৃত্রিম সহৃদয়তার যে তিনি আধার তা বলে শেষ করা যায় না।'

ভাল্‌জাঁ অস্পষ্ট অনুযোগের সুরে বললেন, 'থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। এ সব কেন বলছ? আর আমি যা তোমাদের জন্যে করেছি তা সব পিতাই তাঁদের সন্তানদের জন্যে ক'রে থাকেন।'

মারিউস্‌ বাধা না মেনে পুনরায় বলতে লাগল, তার কণ্ঠে শ্রদ্ধা ভক্তি দরদ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সে বলছিল, 'কিন্তু, আপনি কেন আমায় এ সব সেদিন বলেন নি? আপনারই ত দোষ।

আপনি লোকের জীবন রক্ষা করেন, আর তা তাদের জানতে দেন না। আপনি সাংঘাতিক লোক। নিজের দোষটাই লোকের কাছে বলেন, গুণটা গোপন রাখেন। মানুষ মনে করে আপনি শয়তান। কি ভুলই না হয়েছে আমার!'

ভাল্জাঁ বললেন, 'আমি সত্য কথাই ত সেদিন তোমায় বলেছি, মিথ্যা ত কিছু বলি নি।'

মারিউস্ বলে উঠল, 'মিথ্যা কিছু বলেন নি সত্য, কিন্তু সত্যও ত সব বলেন নি, অনেক গোপন করেছেন। আপনিই যে এম্— শহরের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মঁসিয়ো মাদ্‌লেন, কই সে কথা ত আমায় বলেন নি। কেন বলেন নি? আপনি আপনার পরম শত্রু ইন্সপেক্টর জাভেয়রের প্রাণ রক্ষা করেছেন, কই, সে কথা ত বলেন নি! আমার জীবন রক্ষা ক'রে নর্দ্দমার মধ্য দিয়ে কত কষ্টে যে বেরিয়ে এসেছিলেন, সে কথা ত আমায় বলেন নি!'

'বলি নি, কারণ, আমিও ঠিক তোমার মতই মনে করেছিলাম যে, অতঃপর আমার আর তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত হবে না। তোমার আহত দেহ নিয়ে সেই নর্দ্দমা-পথের যাত্রার কথা তখন যদি তুমি জানতে পেতে তাহ'লে আমি নিশ্চয় জানি যে, তুমি আমায় কখনও কাছ ছাড়া করতে না, তাই বাধ্য হয়েই আমি তখন তোমায় তা বলতে পারি নি। যদি বলতাম, তাহ'লে আজ পথে থাকতাম।'

'পথে থাকতেন! এ কথার মানে কি?—যাক্, আপনি কি এখনও এটা মনে করতে পারেন যে, এর পরও আপনাকে এই

জীর্ণ বাড়ীতে একা অসহায় ভাবে থাকতে হবে? আপনাকে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, আর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি নে। আপনি কোজেৎ-এর বাবা, আমারও। আমরা আর আপনার কোন কথাই শুনব না, একটি দিনও আর আপনাকে ছেড়ে দিব না।'

ভাল্‌জাঁ দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে মৃদু হেসে বললেন, 'একটি দিন কি আর আমিই থাকতে চাই বা চাইলেও থাকতে পারব? তবে তোমাদের ওখানেও আমার যাওয়া হবে না বাবা।'

কোজেৎ পিতার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। ভাল্‌জাঁর চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু এসে জমা হ'ল—যেন তাঁর প্রাণ গলে দুই বিন্দু অশ্রুরূপে চোখের কোণে এসে দুটি শাদা মুক্তার মত টল্‌ টল্‌ করতে লাগল।

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'ঈশ্বর যে করুণাময়, এই পরম সত্যটি আমি আজ এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পারছি। মারিউস্‌, তোমরা দুজনে যখন এই ঘরে এসে প্রবেশ করলে, ঠিক তার আগের মুহূর্ত্তেই আমার অন্তরের অন্তস্তলে খুঁজতে গিয়ে আর কাউকে ত সেখানে পেলাম না,—পেলাম আমার মাকে, আমার কোজেৎকে!'

'কোজেৎ, মা আমার, আমার সময় ঘনিয়ে আসছে, আমি আর বেশীবার তোমায় ডাকব না। এ'স মা, তোমায় শেষবার দেখে নিই।'

কোজেৎ তার মুখখানি ভাল্‌জাঁর মুখের সুমুখে এগিয়ে নিয়ে

গেল। তিনি কন্যার ললাট চুম্বন করলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি বরফের মত ঠাণ্ডা।

কোজেৎ চমকে উঠে বলল, 'বাবা, তোমার ঠোঁট এত ঠাণ্ডা! তোমার কি অসুখ করেছে? বড় বেশী কষ্ট হচ্ছে?'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'কষ্ট!—কই, না। তবে—'

কোজেৎ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তবে কি?'

ভাল্‌জাঁ চুপি চুপি বললেন, 'তবে কি—শুনবে কোজেৎ?—মরণ আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে। ওই দেখ্!'

কোজেৎ ও মারিউস্ আতঙ্কে শিউরে উঠল।

মারিউস্ চেঁচিয়ে উঠল, 'মরণ!'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'হাঁ বাবা, তাতে দুঃখ করবার কি আছে? তোমরা কি বলতে চাও যে, আমি চিরকালই বাঁচব?'

এই বলে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু হাসলেন, কিন্তু তখনই আবার তা মিলিয়ে গেল।

ভাল্‌জাঁ বলতে লাগলেন, 'এমন মরণ কার ভাগ্যে হয়? এ আমার সুখের মরণ! কোজেৎ, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছ, আমার আর কোন দুঃখ নেই। যতটুকু সময় বেঁচে আছি, শুধু তোমার মধুমাখা কণ্ঠস্বর আমায় শুনাও মা।'

মারিউস্-এর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, সে আতঙ্কে পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে সে বলে উঠল, 'না বাবা, আপনি মরবেন না, মরতে আপনাকে আমরা দিব না।'

ক্ষীণ হাসি হেসে তিনি বললেন, 'মরতে কি আমিই

চাইছি? কিন্তু না চাইলেই কি জোর ক'রে মরণকে ঠেকাতে পারব?'

মারিউস্‌ বলল, 'আপনার দেহে এখনও বেশ বল আছে, স্মরণশক্তি এতটুকু কমে নি—এ অবস্থায় মরণ কেমন ক'রে সম্ভব?'

ভাল্‌জাঁ ঈষৎ হেসে স্নেহের সঙ্গে একবার মারিউস্‌ ও কোজেৎ-এর মুখের পানে তাকালেন। পরে বললেন, 'মারিউস্‌, তুমি আমার মরণে আপত্তি করছ। কি জানি, ভগবানের কি ইচ্ছা! জানি নে, হয় ত তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হতে পারে। তোমাদের আসার ঠিক একটু আগেই আমার মনে হয়েছিল, এই বুঝি দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে যায়। তৈরী হয়েও ছিলাম। তারপর তোমরা এলে, মরণ যেন বাধা পেল। হয় ত শেষ পর্য্যন্ত আমি বাঁচতেও পারি। কিন্তু আমি বেশ জানি, আমার আর বাঁচবার অধিকার নেই, সময় হয়ে গেছে। তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। এখন আর আমার কোন কামনা নেই। আজ এই তৃপ্তিটুকু নিয়েই আমি যেতে পারছি যে, আমার কোজেৎকে তুমি সুখী করতে পারবে।'

ঠিক এই সময় ডাক্তার এলেন। তাঁকে দেখে ভাল্‌জা ব'লে উঠলেন, 'এই যে বন্ধু, এসেছ? সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবারের মত বাঁধন ছিঁড়ে চললুম। তোমাদের স্নেহ-প্রীতি আমার একমাত্র সম্পদ। ডাক্তার, আমার মেয়ে-জামাই এসেছে। ওই দেখ আমার কোজেৎ।'

মারিউস্‌ ডাক্তারের স্নমুখে গিয়ে তাঁর পানে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল।

ডাক্তার তখন রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছেন। একবার মাথা তুলে মারিউসের দিকে নীরবে তাকালেন, তার অর্থ—সময় হয়ে এসেছে, আর দেরী নেই।

মুখে বললেন, 'অসুখে পড়ে সব সময়ই কেবল তোমাদের কথাই বলতেন।'

ভাল্‌জাঁ সবই বুঝ্‌তে পারছিলেন। আপন মনেই বললেন, 'মরণ তোমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, কিন্তু তাই ব'লে ঈশ্বর ত অবিচার করেন না।'

এই বলে কি মনে ক'রে একটু হাসলেন। আবার বললেন, 'মরাটা কিছু নয় কিন্তু বেঁচে থাকতে না পারাটাই দুঃখের।'

হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডাক্তার ও মারিউস্‌ দুজনেই তাঁকে ধরতে গেলেন। জোরে হাতের ঝাপটা মেরে তাঁদের দূরে সরিয়ে দিলেন। দেয়ালে ক্রুশে নিহত খৃষ্টের একটি চিত্র ঝুলান ছিল, নিজের হাতে সেটি তুলে এনে নিজের আসনের সামনে ছোট্ট একটি টিপয় ছিল তার উপর বসিয়ে দিয়ে আপন মনেই বলে উঠলেন, 'এঁর মত শহীদ জগতে কখনও জন্মায় নি।'

আস্তে আস্তে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। দারুণ উত্তেজনায় দেহ অবসন্ন। দেহ থেকে প্রাণটা যেন তখনই বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোজেৎ পরমস্নেহ দিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধ'রে পিতার

মাথাটি নিজের কাঁধে তুলে নিল। কথা কইতে চাইছে, কোজেৎ-এর মুখে কথা আটকে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছিল, আর বলছিল, 'বাবা, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। তোমায় জন্মের মত হারাব বলেই কি এতদিন পর তোমায় পেলাম!'

ইতিমধ্যে ভাল্জাঁ একটু সামলে উঠলেন। তাঁকে দেখে তখন আর অত আশঙ্কা থাকে না। মারিউস্ তাই দেখে ব'লে উঠল, 'ডাক্তার সাহেব, দেখুন ত, একটু যেন ভাল বোধ হচ্ছে না!'

ভাল্জাঁ হেসে বললেন, 'মারিউস্, বাবা, আমায় তোমাদের বাড়ী নিয়ে গেলেও কি মরণের হাত থেকে ধ'রে রাখতে পারবে? তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। আমার এখন যাওয়াই ঠিক, বয়সও ত হয়েছে। আমার কথা শোন, তোমরা অধীর হও না। হাজার চেস্টা করলেও আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না। আমি বেশ বুঝছি, এ যাত্রা আর আমার এড়াবার কোন উপায় নেই। কোজেৎ, মারিউস্ তোমায় সুখী করবে। আমার কাছে কত দুঃখকষ্ট পেয়েছ, এবার নিজের ঘরে সুখী হও—এই আশীর্ব্বাদই আমি কায়মনোবাক্যে করছি।'

তিনি সাদরে কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন।

তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'কোজেৎ, মারিউস্, একটি কথা তোমাদের দুজনকে বলবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের যে টাকাটা যৌতুক দিয়েছি, তার একটি পয়সাও অসদুপায়ে উপার্জ্জন করি নি। আজ মরতে চলেছি, আজ আর মিথ্যা ব'লে কোন লাভ নেই, ও টাকার সবই সৎ উপায়ে উপার্জ্জন

করেছি। মনে কোন সন্দেহ না রেখে ও টাকাটা তোমাদের প্রয়োজনে ব্যয় করবে এই আমার একান্ত অনুরোধ। আর একটা কথা, যে নকল চুনীর কারবার ক'রে আমি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছি, তার আবিষ্কার আমারই, সে কৌশল আর কেউ জানে না। কেমন ক'রে সমগ্র ইউরোপে সে দ্রব্য চালিয়েছিলাম, বিস্তৃত ভাবে তা সব একটি কাগজে লিখে রেখেছি। যদি সম্ভব হয়, তোমরা সে ব্যবসা করতে পার। তোমরা আমার দেওয়া অর্থ ও এই কারবারটি গ্রহণ করলে আমি অত্যন্ত সুখী হব।'

ভালজাঁর ঝি বুঝতে পেরেছিল যে মনিব আর বাঁচবেন না। সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে যা দেখল, তাতে তার মনে আর এতটুকু সন্দেহ রহিল না যে, অবস্থা ভাল নয়। সে আস্তে আস্তে প্রভুর সামনে গিয়ে বলল, 'পাদরীকে ডাকব?'

ভালজাঁ আঙুল দিয়ে শিয়রের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার পাদরী ত রয়েছেন। ওই দেখ, তিনি অনেকক্ষণ থেকে ওইখানে এসে দাঁড়িয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।'

তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশপ মিরিয়েলের অমর আত্মা ছায়ামূর্ত্তিতে এসে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কোজেৎ ও মারিউস্‌কে তাঁর কাছে সরে আসতে ইসারা ক'রে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি। কোজেৎ, তুমিও আমায় ভালবাস, তা জানি। আমি মরে গেলে,

তুমি আমার জন্যে কাঁদবে?—না, কেঁদ না। আমি যাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমায় যার কাছে রেখে গেলাম সে তোমার মর্য্যাদা বুঝে তোমায় সুখী করবে। তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসে, আমি জানি। আমার যা-কিছু ছিল সব তোমায় দিয়েছি, কারণ, তুমি ছাড়া আমার এ জগতে আর কেউ নেই। আশা করি, তুমি আমার দেওয়া অর্থের সংব্যয় করবে। না, আমার মাথার উপর যে তাকটি আছে তাতে দুটি রূপার বাতিদান আছে। তুমি নিজের হাতে ওই বাতিদানে দুটি বাতি জ্বালিয়ে দাও। বাতিদান দুটি রূপার কিন্তু আমার কাছে তা অ-মূল্য। এই বাতিদানে যে বাতি জ্বলবে তা হোমাগ্নি-শিখার মতই পবিত্র। জানি নে, যে মানুষের আকারে দেবতা আমায় এ দুটি দিয়েছিলেন তিনি পরলোক থেকে এই সময় আমার উপর তাঁর চির-করুণার দৃষ্টিতে চাইছেন কি-না। জানিনে, আমার কাজে তিনি খুশী হতে পেরেছেন কি-না। কিন্তু আমার যা সাধ্য ছিল, আমি তা করেছি। মনে রেখ, আমি বড় গরীব। আমার সৎকারে কোন ব্যয়বাহুল্য না হয়। কেবল স্থানটি চেনবার জন্যে একটুকরা পাথর বসিয়ে দেবে, তাতে কিছু লেখা থাকবে না। কোজেৎ যদি সময় সময় আসে, আমি পরম শান্তি পাব। আর তুমিও—মারিউস্‌, এই শেষ মুহূর্ত্তে আর কোন কথাই গোপন রাখব না। শোন, আমি স্বীকার করছি যে, তোমার ও কোজেৎ-এর মিলনে আমার প্রথমটা মত ছিল না। কেন, তা বলতে পারিনে, সম্ভবত সংস্কার। আমার মন বলছিল, এ যুবকই একদিন তোমার বুক থেকে তোমার কোজেৎকে কেড়ে

নেবে। সে যাই হোক, এখন কোজেৎ ও তুমি, আমার চোখে দু-ই—এক। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,—তুমি আমার কোজেৎকে সুখী করেছ। মারিউস্, তুমি বুঝবে না, কোজেৎকে আমি কতখানি ভালবাসি। তার মুখে হাসি দেখলে আমি আনন্দে আটখানা হয়ে পড়তাম। তার মুখ মলিন দেখলে, আমার কাছে পৃথিবী আঁধার বোধ হত। কোজেৎ, ওই দেরাজে পাঁচখানা একশ' টাকার নোট আছে, আমার সৎকারের পর তা গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দিও। আর বিছানার উপর ওই যে ছেঁড়া জামাটি দেখছ, ওটি চিনতে পার? মোটে দশ বছর আগেকার! সময় কত শীঘ্র চলে যায়!

'কোজেৎ, তোমার মায়ের কথা হয় ত তোমার এতটুকুও মনে পড়ে না। তার নামও হয় ত তুমি জান না। তোমার মায়ের নাম—ফাঁতিন। নামটা মনে রেখ—ফাঁতিন। যখনই তোমার মাকে মনে পড়বে তখনই ভগবানের কাছে তার আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা ক'র। তোমার মা সমস্ত জীবন ভোর বড় কষ্ট পেয়ে গেছে। একদিনের জন্যও এতটুকু সুখের মুখ দেখতে পায় নি। কিন্তু সে তোমায় প্রাণের চাইতে ভালবাসত। তার ভাগ্যে চির-দুঃখ—তোমার ভাগ্যে সুখ। ভগবানের এই বিধান।

'কোজেৎ, মারিউস্, চললাম। তোমরা দুজনে আমার দু-পাশে বস। সময় সময় আমার কথা মনে ক'র। আরও একটু সরে এ'স। আশীর্ব্বাদ করি, চির-সুখী হও!'

কোজেৎ ও মারিউস্ দুজনে হাঁটু গেড়ে ভাল্জাঁর দু-পাশে

বসল। তাঁর মরণ-শীতল হাত দুখানি দুজনে ধ'রে রইল। হাত দুখানার স্পন্দন থেমে গেছে। ভাল্‌জাঁর মুখে স্বর্গীয় সুষমা, দিব্য জ্যোতিতে উজ্জ্বল। তাঁর চোখ দুটি আকাশের দিকে—বোধ করি ভগবানের পদ-প্রান্তে গিয়ে সে দৃষ্টি পেঁাছেছে।

আকাশে একটিও তারা নেই। ভাল্‌জাঁর কর্ম্মময়, দুঃখময় বিচিত্র জীবননাট্যের যবনিকাপাত হয়ে গেল।